অশ্রুর রং

সপ্তদ্বীপা অধিকারী

সাইডিয়া প্রকাশন

অশ্রুর রং Asrur Rang
সপ্তদ্বীপা অধিকারী Saptadweepa Adhikary

প্রকাশক Publisher
মাসুদ রানা সাকিল Masud Rana Shakil
আইডিয়া প্রকাশন IDEA PROKASHON
রংপুর, বাংলাদেশ Rangpur, Bangladesh
☎☎+৮৮০১৭২৬ ৯৭৬৯৮২ ☎☎+8801726 976982
adideabd@gmail.com

© কৃষ্ণকলি মন্ডল © Krishnakali Mondal

প্রথম প্রকাশ First Edition
ফেব্রুয়ারি ২০২৪ February 2024

প্রচ্ছদ Cover
ধ্রুব এষ Drubo Esh

মূল্য Price
২০০ টাকা 200 TK. $5

মুদ্রণ ও গ্রাফিক্স Printed by
আইডিয়া প্রেস, রংপুর Idea Press, Rangpur

অনলাইন পরিবেশক Distributor
রকমারি ডট কম rokomari.com

ISBN 978-984-98638-6-1
www.ideaabd.com

প্রকাশক ও স্বত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই বইয়ের কোনো অংশের প্রতিলিপি তৈরি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

IP 367

উৎসর্গ
শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায়।

সূচি

বোধের ভিতরে ৯
নীল জামা ১৫
ঘুনির মাছ ২২
পা ২৭
কথা দেওয়া-না দেওয়া ৩২
চাঁদের কলম ৩৬
ইলিশ মাছের ঝোল এবং এক বর্ষার ভোর ৩৯
একটি গান এবং অনলাইনের বৃষ্টি ৪৩
সুখটান ৪৭
অশ্রুর রং ৫১
শীলা জলে ভাসে ৫৬
বৃষ্টির শব্দ অথবা অদৃশ্য মায়া ৬৩
বসন্তের অপেক্ষায় অদিতি ৬৯

বোধের ভিতরে

একদিন এক সুন্দর সকালে ঘুম ভেঙে গেল রতনের। সেইদিন তার স্ত্রীর একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে জয়েন করার কথা। আর পরদিন ভোরে তার নিজের। চোখ মেলেই সে দেখল তার শোবার ঘরটা আকারে বিশাল পৃথিবী হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ঝট করে বিছানা থেকে নেমে বাইরে বার হলো। সামনেই মাকে দেখে সে বলল- "মা, আমার একটা কিছু হয়েছে! কিন্তু কী হয়েছে বুঝতে পারছি না! কী হয়েছে মা আমার?"

মা ঠোঁট টিপে হাসলেন! বল্লেন- "তুই বেঁটে হয়ে গেছিস। এক রাতে তুই এক বিঘত পরিমাণ ছোটো হয়ে গেছিস।"

রতন বিশ্বাস করল না। সে বাবার কাছে গেল- "বাবা, আমার কী হয়েছে?"

বাবা বলেন- "তুই কাল রাতে এক বিঘত পরিমাণ ছোটো হয়ে গেছিলি। এখন আরো চার আঙুল পরিমাণ ছোটো হয়ে গেছিস!"

রতন ছোটো ভাইকে জিজ্ঞাসা করল। আর আরো চার আঙুল পরিমাণ ছোটো হয়ে গেল সে।

সে বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করতেও চার আঙুল করে তার উচ্চতা কমতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই রতনের উচ্চতা ক্রমশ কমতে লাগল। রতন ভয় পেয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করল সে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এই ভাবনা মাথায় আসতেই সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। বুঝতে পারল সে শুধু লম্বায় নয়, চওড়াতেও কমেছে। বালিশটা তার মাথার বালিশ নয় বলেই মনে হচ্ছে তখন। অথবা মাথাটাই তার নয়! মাথাটা তার নয়? তবে কার? রতন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল "আমার কী হয়েছে?"

প্রশ্ন করল বটে। কিন্তু উত্তর কেউ দিল না। আর রতনের উত্তর শোনার থেকেও নিজেকে দেখার আগ্রহই যেন অনেক বেশি। তার গায়ের রঙ পালটে গেছে। লালচে রঙ হয়ে গেছে সারা শরীরের। মাথার চুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে সেগুলো ধরে কেউ গায়ের জোরে টেনেছে। ফলে অধিকাংশ চুল উঠে এসেছে। হড়োনাড়া হয়ে গেছে চুলগুলো। রতন চুলে হাত দিল। হাত ভরে চুল উঠে এল। সে আবার হাত দিল। আরো চুল উঠে এল হাতে। এবার সে দুই হাতে মাথার চুল ধরে বুঝতে পারল চুলগুলো সব আগেই উঠে গেছিল। টাকের উপর জাস্ট বসানো ছিল সেগুলো। রতনের চোখে জল চলে এল। সে আবার উচ্চারণ করল- “আমার কী হয়েছে?” ঘরে যেন ইকো হলো। একই কথা বারবার উচ্চারিত হতে থাকল। কেউ জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ পরে আবিরা ফোন করল।

রতন খড়কুটোর মতো আবিরার ফোনকে জাপ্টে ধরল। “আবিরা, আমার কী হয়েছে।”

আবিরা কুট করে ফোন কেটে দিল।

রতন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ।

আবিরাও তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তার কী হয়েছে? কেন হয়েছে? কখন হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব তো তার চাইই চাই। হঠাৎ মোবাইলে একটা মেসেজ ঢুকল। কুট করে। রতন খুলে দেখল আবিরা পাঠিয়েছে।

“আমি বাড়ি আসছি। সমস্যাটা আর কাউকে বলো না। আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো!”

ফিরে এলো আবিরা। আবিরাকে দেখে অবাক এবং অদ্ভুত এক ভেঙে পড়া মন নিয়ে রতন এক সাথে এক গাদা প্রশ্ন করে বসল। আবিরা বলল যে সে জানে না তার কী হয়েছে। তবে তার যা হয়েছে, রতনেরও সেই একই অসুখ হয়েছে। দুজনে দুজনকে দেখে বুঝতে পারছে। দুজনে গলা জড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল। তাদের সুখের দলিল সেই এপয়েন্টমেন্ট লেটার আবিরার হাত থেকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে জেগে তারা দেখল তাদের ঘরটা আরো অনেক বড়ো হয়ে গেছে। বিছানা বালিশ সমস্তই বিশাল বড়ো বড়ো। বিছানা থেকে সেদিন কেউ নিচে নামতেও পারল না। বিছানার কোণায় বসে থাকা অবস্থাতে মেঝেতে পা ছোঁয়াতেও ব্যর্থ হলো দুজন। দুজনেই চেষ্টা করল

অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ আবিরা বলল- "রতন দেখো, আমার কোমর থেকে ছোট্ট মতো অন্য একটা কিছু বেরিয়েছে।"

রতন আবিরার কোমরে তাকাল। একটা ছোট্ট গুঁটলি দেখতে পেল সে। রতন বুঝতে পারল না। সে বলল- "এসব কী হচ্ছে জানি না আবিরা! চলো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই!"

আবিরা বলল- "আমরা বাইরে বেরলেই আত্মহত্যা করতে হবে আমাদের। আমি না জেনে প্রথম দিন বেরিয়েছিলাম। সেদিন খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছিল। তাতেই আশেপাশের মানুষজনের তাকানো আর কটূক্তি যা শুনেছিলাম, তা সহ্য করা অসম্ভব!"

রতন বলল- "তা ঠিক।"

প্রতিদিনের মতো সেদিনও রতনের মা খাবার নিয়ে ঢুকলেন। রতনকে দেখে তিনি হাসলেন। আজও। অন্যান্য অনেক দিনের মতো। রতন বলল- "মা, আমি কি আর আমি আছি? নেই তো, তাই না? তবু তুমি হাসছো কেন?"

মা বলেন- "নিজেদেরকে নিংড়ে দিয়েছি সুখ কিনতে। তাই সব ঠিক হয়ে যাবে! আমার এই বিশ্বাস আছে। তোরাও তাই বিশ্বাস কর!"

একটু পরে রতনের বাবা ঢোকেন ঘরে।

রতনের বউ আবিরাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। আবিরা বলে ওঠে- "বাবা..!"

তারপর তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না দেখে রতনের বাবার চোখও জলে ভরে এল।

তিনি বল্লেন- "কাঁদিস নে মা! ঘেরাটোপেরও তো একটা সীমাবদ্ধতা থাকে! তাই না?"

আবিরা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। কথা ফোটে না মুখে।

কয়েকদিন পরের কথা। দুইদিন আগে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সকালে চা দিতে এসে মা তাঁর ছেলে আর ছেলে-বউকে খুঁজেও পেলেন না। অনেক পরে দেখলেন তারা দুইজনই লেপের তলায় কুঁকড়ে মুঁকড়ে এই এত্তটুকুনি হয়ে শুয়ে আছে। মানুষ বলে আর তাদের মনেই হচ্ছে না। বৃষ্টি হওয়ায় বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা পড়েছে। মা যথারীতি চা দিলেন। কিন্তু কেউই চা খায় না। চা না খেলে তাঁর রতনের মেজাজ ভালো থাকে না।

পটি হয় না। তিনি জানেন অনেক আগে থেকেই। তবু রতন আর আবিরা মুখ ফিরিয়ে রইল।

মা বলেন- “বাবা, চা খা!”

রতন বলে “ভাল্লাগছে না মা!”

আবিরা বলে- “চা ফা আর খাব না মা। শুকনো পাতা দেবেন দুটো?”

মা বলেন- “শুকনো পাতা দিয়ে কী হবে?”

দুজনেই একসাথে বলে- “খাব!”

মা বলেন- “কেন? সক্কাল সক্কাল শুকনো পাতা কেন খাবি?”

আবিরা হঠাৎ লেপের ভিতর থেকে গুটি গুটি বাইরে বেরিয়ে আসে।

মায়ের সামনে উঠে এসে বলে- “এই দেখুন আমার সারা গায়ে শত শত গুটলি মতো বেরচ্ছে। আপনার ছেলেরও বেরিয়েছে!”

মা বললেন- “কই বাবা রতন, দেখা আমাকে!”

রতন বলে- “আবিরা ঠিক বলেছে মা! আমারও কোমর থেকে, পেট থেকে এমন কী গলা থেকে, মুখ থেকেও গুটলি গুটলি মতো কীসব বেরিয়েছে। এবং আরো বেরুচ্ছে মা। সরু, সরু। লম্বা, লম্বা। ট্রেনের লাইনের মতো। সারি, সারি। সেই জন্যই শুকনো পাতা খাব, মা!”

মা ওদের কিছুতেই এক বিন্দুও চা খাওয়াতে পারলেন না। বাইরে বেরিয়ে মায়ের সাথে বাবার আবার কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। উভয়ে উভয়কেই দোষারোপ করেন।

সেইদিনের পরে রতনের মা রতনকে আর বিছানায় দেখতে পেলেন না। আবিরাকেও নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি আরো বেড়ে গেল। রতন আর আবিরাকে আর কেউ খুঁজে পেল না।

তারপর আবার একদিন খুব সকালে রতনের ভাই তপনের ঘুম গেল ভেঙে। সে তাকিয়েই দেখল তার ঘরটা অত্যন্ত বড়ো হয়ে গেছে।

তারপর সেও একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি মুখর দিনে চা খাওয়া ছেড়ে দিল।

তারপরের দিন তারও কলেজে চাকরিতে জয়েন করার দিন ছিল। রতনের ভাই তপনকে তার বাবা বললেন- “দেখো, আমাদের আর কোনো উপায় নেই। তোমার দাদার সুখ কিনতে চেয়ে সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছিলাম। এই

বসতবাড়িটাই বাকি আছে। তোমার জন্য এইটাও বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। দেখো, দাদার মতো কান্নাকাটি করে সবদিক মাটি করো না!”

বাবাকে কথা দিয়েছিল তপন। সে দাদার মতো হবে না কিছুতেই। কিন্তু এপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেতেই সেও সারারাত নির্ঘুম কাটিয়ে ছটফট করে সকালে জেগে উঠল। আয়নার সামনে গিয়ে সে আগে নিজেকে দেখল। তারও মাথার চুল ততক্ষণে উঠে গেছে সব। তারও আয়তন কমতে আরম্ভ করেছে। সে ভয় পেয়ে গেল। কিছুদিন পরে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পেল তারা।

তখন মা কাঁদছেন।

তখন বাবা আফশোস করছেন। তিনি সন্তানদের মানুষ করতে পারেননি।

ছোটো হতে হতে রতনের ভাই তপনের উচ্চতা তখন এক বিঘত।

তখন বাবার সাথে মায়ের তুমুল ঝগড়া আর অশান্তি চলছে। মা এই সমস্ত অঘটনের জন্য তাঁর ঘুষ খোর স্বামীকে দোষারোপ করছেন।

বাবা বলছেন- “ঘুষ সবাই দিচ্ছে। সবাই নিচ্ছে। কারুর ছেলে নিরুদ্দেশ হচ্ছে না তো! তোমার ছেলে কেন হচ্ছে?”

মা বলেন- “যদি বুঝবেই তাহলে আর ঘুষ নেবে কেন? গরিব গরিব মানুষের রক্ত শুষে খেয়েছো, সেই জন্যই নিজেদের ছেলেদের সুখ কিনতে ঘুষের টাকায় কেনা সম্পত্তি সব বিকিয়ে দিতে হয়েছে! এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটাও রইল না আর!”

বাবা এতকিছুর পরেও বলেন- “না থাকলে না থাকবে! ঘুষের জিনিস, ঘুষেই গেছে। তাতে কী হয়েছে?”

মা কাঁদেন। চিৎকার করেন! অভিশাপ দেন।

বলেন- “আমি কিচ্ছু জানি না। আমার ছেলেদের ফেরত চাই। আমার বউমার কী অপরাধ ছিল? ওকে তুমি তো জন্ম দাওনি!”

বাপ বলেন- “জন্ম দেইনি ঠিক কথা। এসেছিল কেন ঘুষ দিয়ে চাকরি নিতে? ঘুষ দিয়ে চাকরির গ্যারান্টি ছিল বলেই তো আমার ছেলেকে বিয়ে করেছে। প্রেম করল যে ছেলেটার সঙ্গে, তাকে ছেড়ে আমার ছেলেকে বিয়ে করল কেন? বোঝো না? শুধুমাত্র ঘুষের চাকরির লোভেই প্রেমিককেও অবলীলায় ত্যাগ করেছে। কারণ সেই ছেলে তো প্রতিবাদী দলের সদস্য! আর তুমি সারাজীবন সমস্ত সুখ ভোগ করেছো। তখন তো মুখে রা কাড়োনি! এখন খুব

কথা ফুটেছে, না? মেয়ে মানুষদের চরিত্র আমার জানা হয়ে গেছে!”

তপন বলে- “চলো দেখি দাদার ঘরে। দাদা কোথাও না কোথাও ঠিকই আছে। বৌদিও আছে। মা, দাদাকে না পেলে, বৌদিকে না পেলে বোঝা যাবে আমিও হারিয়ে যাব।”

তপনের মা কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলান। বাবা বলেন- “কোথায় আর যাবে। ঘরেই আছে। কাপুরুষের মতো লুকিয়ে! তপন তুই কাঁদিস না। তুই না পুরুষ! পুরুষ মানুষকে কাঁদতে নেই!”

বলে বাবা নিজেই রতনের ঘরে ঢোকেন। অন্যরাও আসেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকেন। খাটের তলা। আলমারির ভিতরে। নাহ! কোত্থাও নেই! তপনও খোঁজে। ডাকে সে- “দাদা...! দাদা রে! তুই কোথায় দাদা? আমাদের খুব বিপদ রে?”

কেউ সাড়া দেয় না। মা বিছানার লেপ তোলেন। লেপের ভিতরে দুটো লাল লাল কীট!

মা চিৎকার করে ওঠেন- “এই তো আমার বাছারা, এই তো আমার রতন...!”

বাবা বলেন- “আজেবাজে বকো না তো। ওরাই যদি হয় তো ঠিক সাড়া দেবে। ডাকো তুমি...!”

মা ডাকেন- “রতন বাপ আমার...!”

ভাই আস্তে করে ধরতে যায় পোকাদুটোকে। ছোঁয়া লাগতেই একদম গুটিয়ে গোল্লা পাকিয়ে যায় লাল লাল সহস্রপদী কেন্নো দুটো।

বাবাও সেইদিকে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কেন্নো দুটো সোজা হলো। শতশত পা মেলে পিলপিল চলতে লাগল। বিছানা ছাড়িয়ে নীচে পড়ে থাকা এপয়েন্টমেন্ট লেটারের কোনগুলোকে কুটকুট করে খেতে লাগল।

পৃথিবীতে তখন আর কোনো শব্দ নেই। সমস্ত চুপচাপ। নিস্তব্ধ!

নীল জামা

মেয়ে এবার পুজোয় নীল রঙের জামা চেয়েছিল। সেই মতই প্রশান্তবাবু একটা নীল রঙের জামাই বন্ধুকে আনার জন্য বলে দিয়েছিলেন। মেয়েকে অবশ্য এ কথা তিনি জানাননি যে, বন্ধুর দোকান থেকে বিনে পয়সায় জামাটা আনছেন। পয়সা বাঁচানোর আর কোনো পথ তাঁর জানা ছিল না। সুমনবাবুর নিজের দোকান আছে। বহু বছরের পুরানো দোকান। আর প্রশান্তবাবুর সাথে সুমনবাবুর একেবারে গলায় গলায় বন্ধুত্ব। একই অফিসে চাকরি করেন দুজনেই। অফিসের অনেকের কাছেই প্রশান্তবাবু শুনেছেন যে, সুমনবাবু নাকি পয়সার ব্যাপারে একদম চক্ষুলজ্জাহীন চামার। কিন্তু তাঁর নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সুমনবাবু তাঁর কাছে জামার দাম চাইতে পারবেন না। প্রশান্তবাবু ঠিকই বুঝেছিলেন। সুমনবাবু জামার দাম চাইতে লজ্জাই পেলেন। যাক বাবা এই মাজ্ঞি গণ্ডার বাজারে বিনা পয়সায় একটা জামা তো পাওয়া গেল। তিনি ভাবলেন।

আর সুমনবাবু ভাবলেন- “শালা হাড়কিপ্টে! পয়সাটা ঝেড়ে দেবার তালে আছে।” মনে মনে জামাটা দেবার পরে প্রশান্ত বাবু যে জামার দাম অফার করবেন সুমনবাবু সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। জামাটা তিনি যখন দিলেন প্রশান্তরবাবুর হাতে, প্রশান্তবাবু একবারও বললেন না, যে এই নে, তোর জামার দাম। সুমনবাবুর রাগে শরীর জ্বালা করে উঠল কিন্তু মুখ খুলতে পারলেন না তিনি। প্রশান্তবাবু বাড়ি গিয়ে জামাটা মেয়ের হাতে দিলেন। মেয়ে প্রফুল্ল মনে জামার প্যাকেট খুলল। হাসি মুখ তার মুহূর্তে গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

"বাবা, তোমাকে আমি নীল রঙের জামা আনতে বলেছিলাম।”

প্রশান্ত তাকিয়ে দেখলেন জামাটার রঙ একদম লাল টকটকে। তিনি বল্লেন- “এ হে হে, দোকানদারই ভুল করেছে। আমি নীল জামাটাই প্যাকেট করতে

বলেছিলাম। ঠিক আছে কাল পাল্টিয়ে আনছি!”

পরদিন তিনি বন্ধু সুমনকে বল্লেন- “তুই শুনিসনি ভালো করে যে আমি তোকে নীল রঙের জামা আনতে বলেছিলাম!”

সুমনবাবু বলেন- “নীল রঙেরই তো দিয়েছিলাম রে।”

প্রশান্ত জামাটা প্যাকেটশুদ্ধ এগিয়ে দেন বন্ধুর দিকে- “এই দ্যাখ, কী রঙের জামা দিয়েছিস!”

সুমনবাবু প্যাকেট খুলে এগিয়ে দেন প্রশান্তরবাবুর দিকে- “তুইই দ্যাখ না, কী রঙের জামা দিয়েছি তোর মেয়েকে!” প্রশান্তবাবু তাকিয়ে দেখেন গাঢ় নীল রঙের একটা জামা প্যাকেটের মধ্যে। প্রশান্তবাবু বললেন- “কিন্তু মেয়ে যে বলল জামাটার রঙ লাল!”

সুমনবাবু বলেন- “মেয়ে বলল আর তুই মেনে নিলি? একবার নিজে দেখবি না?”

প্রশান্তবাবু বিড়বিড় করলেন- “আমার তো মনে হচ্ছে নিজেও লাল রঙই দেখেছিলাম তখন।”

সেদিন অফিস ফেরত প্রশান্তবাবু আবার ওই একই নীল রঙের জামাটা নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন রাতে। মেয়ের হাতে প্যাকেটটা দিয়ে বললেন- “এই নে, ভালো করে দেখে নে!”

মেয়ে জামাটা হাতে নিয়ে বলল- “প্যাকেট তো একই আছে বাবা!”

বাবা বলেন- “প্যাকেট একই হলে বুঝি ভিতরের জিনিসও একই হয়?”

মেয়ে জামা খুলেই চিৎকার করে বলল- “একী বাবা? তুমি আজ আবার হলুদ রঙের এনেছো কেন? লাল নয় বাবা, হলুদও নয়। আমি নীল রঙের জামা চাই!”

প্রশান্তবাবু জামাটা হাতে তুলে নিলেন। একদম মিষ্টি হলুদ রঙের একটা নতুন জামা।

জামাটা তিনি চোখের সামনে তুলে ধরলেন। বারবার। হ্যাঁ, হলুদ রঙেরই। অদ্ভুত তো! মেয়ে বলে- “বাবা, চোখের ডাক্তার দেখাও।”

পরদিন প্রশান্তবাবু আবার জামাটা ফেরত নিয়ে গেলেন অফিসে।

সুমনবাবু জামাটা ফেরত নিয়ে বললেন- “দ্যাখ, আমার মনে হচ্ছে আমি নীল

রঙের জামাই দিয়েছি। তোদের ভুল হচ্ছে কোথাও!”

বলতে বলতে জামার প্যাকেট খোলা হলো। হলুদ জামা কোন্ ম্যাজিকে নীল রঙের হয়ে গেল। এবার প্রশান্তবাবু সুমনবাবুকে বল্লেন- “বিশ্বাস কর, আমিও বাড়িতে হলুদ রঙের জামাই দেখেছি!”

সুমনবাবু বলেন- “তার মানে তুই কী বোঝাতে চাইছিস?”

প্রশান্তবাবু বলেন- “আমি নিজেই কিছু বুঝছি না। নিজে বুঝব তবে তো অন্যকে বোঝাব?”

সুমনবাবু বলেন- “আমার মনে হয় তোর মেয়ের জামা পছন্দ হয়নি বলে ও এভাবে অন্য রঙের জামা দেখিয়ে আসলে পাল্টাতে চাইছে!”

প্রশান্তবাবু বলেন- “আমার তা মনে হয় না। কারণ ওতো আমার সামনেই প্যাকেট খুলেছে। আমি আর ওর মা, আমরা দুজনেই তো দেখেছি!”

সুমনবাবু বলেন- “আগের বারে যেন কী রঙ দেখেছিল?”

প্রশান্তবাবু বলেন- “আগেরবারে এক্কেবারে ক্যাটকেটে লাল রঙ দেখেছিল।”

সুমনবাবু বলেন- “আগেরবারে তুই নিজে দেখেছিলি?”

প্রশান্তবাবু বলেন- “হুম। আমি নিজে না দেখে আনব কেন ফিরিয়ে?”

সুমনবাবু বলেন- “আশ্চর্য। চল্লিশ বছর ব্যবসা করছি এমন বিদঘুটে ব্যাপার কখনো ঘটেনি!”

কিছুক্ষণ পরে সুমনবাবু বলেন- “দ্যাখ, যাতায়াতের সময় কোথাও কারো সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে।”

প্রশান্ত বাবু বল্লেন- “একদম তাই। ঠিক বলেছিস। ট্রেনে উঠেই তাস খেলি তো। কোলের উপর আর ওই প্যাকেটটা না রেখে উপরে বাংকে রেখে তাস খেলি। নামার সময় প্যাকেট নিয়ে নেমে যাই। তুই একদম ঠিক বলেছিস। কারো সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে।” সামান্য একটা জামার জন্য কী যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন তিনি! বুকের মধ্যে একটা জমাট বাঁধা “কিন্তু” এবং “কেন” জমা হচ্ছিল দিন দিন। অথচ এর কোনো উপযুক্ত কারণ ছিল না! পৃথিবীতে যত আছে “কিন্তু” এবং “কেন” তারাই সমস্ত দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশান্তবাবু বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর অকারণে অস্বস্তি বাড়ছে। আজ তিনি জামাটা আর হাতছাড়া করলেন না। তাস খেলা হলো ঠিকই কিন্তু কোলের উপর

জামার প্যাকেটটা পড়েই থাকল। নিজের স্টেশন এলে কোল থেকে জামার প্যাকেট তুলে নিলেন। এবং বাড়ির পথে রওনা দিলেন। বেশ লাগছে আজ তাঁর। সামান্য একটা জামার জন্য তিনি যে এতটাই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়বেন তা কল্পনাই করেননি। আহ্, আজ নিশ্চিন্ত। আগের দু দু বার উপরের বাংক থেকে জামা পাল্টাপাল্টি হয়েই গেছিল তবে। তিনি এখন নিশ্চিত। ভাগ্যিস বিষয়টা নিয়ে তিনি সুমনবাবুর সাথে কথা বলেছিলেন বিস্তারিত! নইলে ওই ঘটনা আবারও ঘটতে পারত। পুজোর সময়। অনেকেই জামা কেনেন। অনেকেই নয়, সব্বাই কেনেন। আর তাঁর মেয়ের বয়সী মেয়ে যে আর কারো নেই তা ভাবলেন কী করে তিনি? পাঁচ লক্ষ মানুষের মেয়ে তাঁর মেয়ের বয়সী হতেই পারে। অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রশান্ত বাবু আজ মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্যাকেট মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন- “এই নে।” মেয়ে জামার প্যাকেট নিয়ে তার ঘরে যাচ্ছিল। প্রশান্ত বাবু বল্লেন- “এক মিনিট। এই প্যাকেট নিয়ে কোথাও যাবি না! আমার সামনে দাঁড়িয়ে এখুনি এই প্যাকেট খুলবি!” সুমনবাবুর বলা কথাটাই তাঁর মাথাতে ঘুরছে। মেয়ের হয়ত পোশাকের ডিজাইন পছন্দ হয় না। তাই ওরই অন্য জামা দেখিয়ে দেয়। পরে আবার প্রশান্তবাবুর আনা জামা প্যাকেটে রেখে দেয়। হতেই পারে।

মেয়ে বলল- “কেন বাবা? এখানে দাঁড়িয়েই কেন খুলতে হবে? তারমানে কী? আজও কি নীল রঙের জামা আনোনি?” বলতে বলতে মেয়ে প্যাকেট খুলে ফেলল। কুচকুচে কালো রঙের একটা জামা দেখে আজ মেয়ে চিৎকার করল- “মা, ওমা দেখে যাও...!”

চন্দ্রানী এগিয়ে এলেন- “কী ব্যাপার? এত চেঁচামেচি কেন?”

মেয়ে বলে- “আমি একটা নীল রঙের জামা চেয়েছি বাবার কাছে এবার পুজোয়। বাবা প্রতিদিন একটা একটা জামা আনছে। কিন্তু এক একদিন এক একটা রঙের জামা আনছে বাবা। জামা নানারকম রঙের আনছে আর আমাকেই অবিশ্বাস করছে। দেখো আজ এনেছে কালো রঙের জামা!”

চন্দ্রানী বলেন- “কী ব্যাপার বলো তো। সামান্য একটা নীল রঙের জামা আনতে পারছো না!”

প্রশান্ত বাবু কী করবেন? কী বলবেন? ভেবে পাচ্ছেন না! তিনি কালো রঙের জামাটা নানারকম করে দেখছেন। সামনে পিছনে উল্টিয়ে পালটিয়ে। কিন্তু সর্বত্র জামাটার একই রঙ। আর সেই রঙটা হলো কালো। তিনি বলেন- “আমি কিন্তু রোজ নীল রঙের জামাই আনি। বিশ্বাস কর। নিজে দেখে আনি। আজও

নীল রঙের জামাই এনেছি।” চন্দ্রানী বলেন- “তুমি কী বলতে চাও! তুমি নীল রঙের আনো আর বাড়িতে আসার পরে রঙ বদল হয়ে যায়? বাড়িতে কি ভূত আছে? আমরা সবাই কি ভূত?”

বলতে বলতেই চন্দ্রানী হঠাৎ যেন অত্যন্ত জরুরি কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভাবে বলেন- “আচ্ছা, তুমি কোন্ পথ দিয়ে ফেরো? সত্যি কথা বলবে!”

প্রশান্ত বাবু বলেন- “যে পথ দিয়ে রোজ ফিরি, সেই একই পথ ধরে...!”

চন্দ্রানী বলেন- “মানে? তুমি কি ভাগাড়ের সামনে দিয়েই আসো রোজ?”

প্রশান্ত বাবুর মনে পড়ে গেল। চন্দ্রানী বহুবার বলেছে ভাগাড়ের রাস্তাটা এড়িয়ে যেতে। রাতের বেলায় একটু ঘুরে শিবানী বউদিদের বাড়ির উপর দিয়ে আসতে। প্রশান্ত বাবু তা মানেন না। গ্রামের সবার ধারণা ভাগাড়ে ভূত বা প্রেতাত্মা থাকে। মৃত মানুষের কাপড়-চোপড় ওই ভাগাড়ে পোড়ানো হয়। আর পশু পাখিদের মৃত শরীরও ওখানেই ফেলা হয়। প্রশান্ত বাবু কোনোদিন ওইসব মানেননি। আজো যে মানবেন না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তার জন্য চন্দ্রানী যে আজ এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবেন তা তিনি ভাবতেই পারেননি। চন্দ্রানী পাড়া-প্রতিবেশীকে, আত্মী-স্বজনদের এবং বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি প্রভৃতি সকলকে ফোনে জানালেন। মা মেয়ে কান্নাকাটিও করল অনেক। অবশেষে ওঝার বাড়ির ঠিকানা নিলেন এবং পরদিন প্রশান্তর অফিস থেকে বেশ কিছুদিনের ছুটি নিতে চাপাচাপি করতে লাগলেন। পরদিন ওঝা এসে প্রশান্তকে ঝাড়াবেন। কালো সর্ষে আনা হলো। শুদ্ধ ও খাঁটি সর্ষের তেল আনা হলো। গঙ্গা জলেরও ইতর বিশেষ আছে। তাও আজ শুনলেন তিনি। প্লাস্টিকের বোতল অশুদ্ধ। কাচের বোতলের গঙ্গা জলে পরিশুদ্ধতা থাকে একশত ভাগ। কুমারী মেয়ের আর বিধবাদের তোলা গঙ্গা জলের ভূত তাড়ানোর ক্ষমতা বেশি থাকে। প্রশান্তকে পরদিন অফিসে যেতে দেওয়াও হবে না, এইসব আলোচনা হচ্ছে!

প্রশান্ত সারারাত কারুর কথার কোনো প্রতিবাদ করেননি। সকলের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে প্রশান্তবাবু এখন সকলের কথা শুনবেন। কিন্তু পরদিন ভোরে প্রশান্তবাবু সবার অলক্ষ্যে টুক করে বেরিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সেই কালো রঙের জামার প্যাকেট। যাবার পথে কয়েকবার খুলে খুলে দেখে নিয়েছেন জামার রঙ। কুচকুচে কালোই। অফিসে এসেও খুলে দেখলেন। কালো রঙ নীল হলো না। তিনি জামাটাকে প্যাকেটমুক্ত করে টেবিলে রাখলেন। সুমনবাবু এলেই ডাকলেন নিজের টেবিলে।

বল্লেন- “এই দেখ, কাল তুই এই কুচকুচে কালো রঙের জামাটাই দিয়েছিস! আমি জামাটাকে আজ প্যাকেটে ভরিনি।”

সুমনবাবু বলেন- “তুই কী বলতে চাস? পরিষ্কার করে বল!”

প্রশান্ত বাবু বলেন- “আমি কী বলব বলতো। আজ জামার রঙ তো কই নীল হলো না এখনো। আমার ধারণা প্যাকেটের ভিতরে প্রবেশ করালেই জামার রঙ পালটে যাচ্ছে। দেখ, আজ রঙ একই আছে। ব্যাপারটা বুঝতেই পারছি না!”

তিনি আরো বলেন- “আমি স্বীকার করছি, যে, তোর কাছ থেকে জামা নিয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার পয়সাটা বেঁচে যাবে। কিন্তু আমার ভুল হয়ে গেছিল।”

বলেই তিনি টাকা বাড়ালেন সুমনবাবুর দিকে।

সুমনবাবুরও ভিতরে এতদিন জ্বলন ছিল। মনে মনে কত বলেছেন- “শালা তোর বাপের দোকান? কত লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে হয়েছে জানিস?” সেই একই মানুষের ভিতরের শয়তানের মৃত্যু ঘটতে সময় লাগল না। তিনিও বলে ফেল্লেন- “তুই কী বলছিস প্রশান্ত! তোর মেয়ে কি আমার মেয়ে নয়? তাকে আমি পুজোয় একটা জামা উপহার দিতে পারি না?”

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই বলেন- “না, পারিস না। তোর যদি ইচ্ছে হয়, তুই আলাদাভাবে একটা জামা আমার মেয়েকে, আমাদের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবি। কিন্তু এই জামার পুরো টাকা তোকে নিতে হবে। নইলে আমি অন্য কোথাও থেকে নীল জামা কিনে নেবো।”

সুমনবাবুর ভালো লাগল। এতদিন তিনি ক্ষতির হিসেব করছিলেন। আজ তাঁর মনের দুশ্চিন্তা ঘুঁচে গেল। বরং লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলেন যেন। বল্লেন- “তোর জায়গায় আমি থাকলেও একই কথা বলতাম। তবে আমার একটা অনুরোধ আছে। আগামী রবিবার তোদের বাড়ি যাচ্ছি।”

প্রশান্তবাবুও হাসলেন। বল্লেন- “তুই সবসময় আমার বাড়ি স্বাগত।”

তারপর সুমনবাবু বললেন- “কাল অবশ্যই নীল জামাই নিয়ে আসব। যেমন এই কদিনও এনেছিলাম।” বলতে বলতে সুমনবাবু গত দিন যে নীল জামা দিয়েছিলেন, যা প্রশান্ত বাবুর বাড়িতে গিয়ে কালো হয়ে গেছিল, সেটার দিকে চাইলেন। টেবিলের উপর তখনো সেই কুচকুচে কালো জামাটাই পড়ে রয়েছে। সুমনবাবু ওই কালো জামাটাই প্যাকেটে ভরে প্রশান্ত বাবুর হাতে তুলে দিলেন।

বল্লেন- “জামা তার উপযুক্ত দামই পেয়েছে। এইটাই নীল জামা। বাড়ি নিয়ে যা। আজ আর তোর মেয়ে অন্য রঙ দেখবে না। নীল জামাই পাবে!”

প্রশান্ত বাবু বহুদিন বাদে ফুরফুরে মনে বাড়ি ফিরছেন। জামার প্যাকেট ট্রেনের বাংকেই রেখেছেন। তাস খেলেছেন। ভাগাড়ের পথ দিয়েই বাড়ি ফিরেছেন। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। আজ আর তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। মেয়ে আজ নীল জামাই পাবে। ঘরে ঢুকেই তিনি জামাটিকে প্যাকেট-মুক্ত করতে করতে ডাকলেন- “মামণি, এ-ই নে তোর নীল জামা।”

ঘুনির মাছ

ছানা কাটা দুধের মতো ঝিমুনি ঝিমুনি নষ্ট বিকেল। যেন অসময়ে বিধবা পৃথিবীর ঋতুচক্রের চারদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। মন-মেজাজ ভালো নেই তার। বমি বমি ভাব। তাই তো আকাশ জুড়ে গতর ভাসানোর মতো ঘন কালো মেঘ। গত সাতদিন ধরে বৃষ্টি থামার কোনো নামগন্ধ নেই। পুকুর উপচে উঠেছে। এই সাতদিনেই কলমি শাকগুলো কেমন লকলক করে বেড়ে উঠেছে। ভিতরের টই-টম্বুর জলের তাড়নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার নরম ডগা। পুকুরের পূর্বকোণ থেকে কোদাল দিয়ে পাঁচু ঋষিদাস সরু নালা কেটে দিচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। জল বের করে না দিলে সমস্ত মাছ বেরিয়ে যাবে। একটু গভীর গর্ত করতে হচ্ছে। ঘাসে-জলে-মাটিতে কোদাল পড়ছে ফচাত ফচাত করে। কাদা-মাখা ঘন জল মুখে ছিটকে আসে পাঁচুর।

সে বলে ওঠে- “এহহে, মুকির মদ্যি ঠুসি এইয়েচ কেরাম দেকোদিন- থুহ থুহ...” থুতু ফেলে আর মাটি কোপায়। সুযোগ পেতেই বিরহিনী যুবতীর মতো টইটম্বুর পুকুর হু হু করে জল ছাড়ে সরু নালি দিয়ে। উপচে পড়ে বর্ষার জল। পাঁচু দেখে পুকুরের জলে মাছেরা আনন্দে নাচানাচি করছে। চকচকে পুঁটি, তেলাপিয়া সদ্য জন্মানো বাছুরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের উপর। একটুখানি লেজ নেড়ে নাচ দেখিয়ে আবার টুপ করে জলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। চতুর্দিকে গ্যাঙর গ্যাঙ ব্যাঙ ডাকছে। পাঁচু বাড়ির দিকে একবার তাকাল আবার মাটি কাটায় মন দিল। হঠাৎ একটা মাঝারি সাইজের রুই চলে এল সেই সরু নালায়। নতুন বর্ষায় পুকুরের মিষ্টি জলের রুইয়ের রং খুলে গিয়ে কেমন ঝকঝকে লাগছে গায়ে-গতরে। পাঁচু কোদাল দিয়ে এক ঘা মারল। আহত হলেও লেজ নেড়ে নেড়ে পালাতে চাইল রুই। পাঁচু সপাসপ কোদালের বাড়ি মারল। তারপর ধরে ছুঁড়ে মারল ডাঙায়। আর বাড়ির দিকে

মুখ করে চিৎকার করে বলল- "সাধন রে, হ্যারা ওই সাধন... এই বিস্টি বাদলায় কতখুন ভিজবু মুই একলা একলা বলদিন... এল্লোতে ছাবালের একুনো আসার নাম নেইকো...!"

বছর তেরোর সাধন হাতে একটা ঘুনি, একটা খেপ জাল আর গলায় একটা গামছা জড়িয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

প্রথমে ওই খেপ জাল পাতা হল পুকুরের কোনায়- যাতে জল বেরলেও মাছ না বার হয়। তারপর মাটিতে আরও গভীর গর্ত করে ঘুনি পেতে দেওয়া হলো। ঘুনির দুই পাশে মাটি দিয়ে ভালো করে পথ আটকে দেওয়া হলো, যাতে বাইরের দিকে এক বিন্দু জল না যেতে পারে। হু হু হু হু করে জল ঢুকছে ঘুনিতে। বাঁশের সরু সরু দাঁড় দিয়ে তৈরি ঘুনিতে মাছ একবার ঢুকলে আর বেরতে পারে না। সামনের দিকে মুখ খোলা ইংরেজি এম অক্ষরের মতো দরজা, যার মাঝখানটা নরম এবং পাতলা। জলের তোড়ে ওই অংশটা হাট করে খুলে যায়। জলের ওই টানেই জলের সাথে সাথে পুঁটি-খলসে-চিংড়ি-কই ঢুকে যায় ঘুনির ভিতর। পিছনে ফাঁকা ফাঁকা দাঁড়ের দেওয়াল। সেখান থেকে হু হু করে জল বার হয় বটে তবে মাছ বার হতে পারে না। পাঁচু ঘুনি পেতে তার ছেলেকে নিয়ে পুকুরের স্নানের ঘাটে এলো। ডুব দিয়ে স্নান করল আর ভিজতে ভিজতে ঘরে ফিরল। সাধন পুকুরে নামে। সাঁতরায়! এ মাথা ও মাথা করে। জোরে জোরে গান করে।

বৃষ্টির শব্দ, মেঘের গুড়ুম গুড়ুম, ব্যাঙের গ্যাঙর গ্যাঙ, মিলেমিশে শ্রাবণ দিনে পিয়া মিলনের বাসনায় কাতর পৃথিবীর অপূর্ব রূপ ফুটে ওঠে। ধোঁয়া ধোঁয়া রঙের মেঘের মাঝে বিদ্যুতের এক একটা ঝলক যেন তার শরীরের কামনার আগুন।

পাঁচু ঘুনি পেতে স্বপ্ন দেখে তার পুকুরের মাছ তারই পাতা ঘুনিতে আটক থাকবে সারারাত। সকালে উঠে ধীরে সুস্থে গিয়ে সে মাছগুলো নিয়ে আসবে। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে বৃষ্টিমুখর দিনটা রসনাতৃপ্তিতে ভালোই কাটবে। সম্পন্ন চাষি পাঁচুর ঘুনি পাতার খবর গরিব পাড়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

অনন্ত মালো যখন মারা যায়, তখন তার সুন্দরী বউয়ের বয়স মাত্র বাইশ। পেটের ভিতরে ছোট্ট অনন্ত মালোকে নিয়ে সে ওই বয়সে বিধবা হয়েছিল। তখন সে ভেঙে খান খান হয়ে গেছিল। একাকিত্বের যন্ত্রণা নয়, প্রিয় মানুষটাকে ছাড়া বাঁচবে কেমন করে, এই ছিল তার একমাত্র চিন্তা! বিশেষ করে পেটে তার স্বামীর বংশধর! কিন্তু সন্তানের জন্ম দেবার পর পরই তার মানসিক

যন্ত্রণা উপচে ভরা বর্ষার জল শরীরের আনাচে কানাচে খলবলায়। সে বুঝতে পারে তার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার কথা। এদিকে শাশুড়ি আর ঠামি-শাশুড়ির প্রতিনিয়ত বিধিনিষেধের বেড়াজালে জীবন তার বৃষ্টিহীন খরার মতো শুকনো খটখটে হয়ে থাকে। একজন বাইশ বছরের মেয়ের জিহ্বা যতখানি নিরামিষাশী হতে বাধ্য হলো, তত সে র খিস্তি দিতে শিখল। তত সে অসৎ হতে চাইল। কিন্তু অসৎ হওয়ার সুযোগ সৎ মানুষেরা সহজে পায় না। তার বান্ধবীকে সে বলে- "মোর প্যাটের মদ্যি সাগর রইয়েচ আর লদি!"

বান্ধবী এখনো বিয়ে করেনি। সে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে!

বিধবা মালো বলে- "দুটো শোল মাছের পোনা ছেড়ি দিলি ফরফর করে এক হাত লম্বা হয়ি যাব্যানি!"

বান্ধবী বলে- "শোল মাছ তোর এত পছন্দ?"

বিধবা মালো বলে- "শনি ঠাকুরির কুদিষ্টি পড়লি মেয়ে মানুষ বেদবা হয়। আর কেডা না জানে শোল পোড়া দে গরম ভাত খেলি কুদিষ্টি পেলগে যায়!"

বান্ধবী মুখে হাত দিয়ে ভাবে। মাথা নাড়ে। তারপর বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা টিন্তা করে বলে- "থালি মুই এমন ঘরে বে করব ঝাদের পুকুরি মেলা শোল মাছ রইয়েচ!"

কমলা মালো কুমারী । অন্যজন বিধবা। কোথায় যেন মিল তাদের। কোথায় যেন অমিল। কে যেন একটু বেশি বোঝে। কে যেন কল্পনাতে ছাড়িয়ে যায়। তবে দুজনের সাথে দুজনের বড্ড ভাব। বড্ড ভালোবাসা।

ঘুনিটা যখন পাতা হলো, তখন দরিদ্র মানুষগুলো জেনে গেল। জেনে গেল যে সারাটা রাত একটা বন্ধ ঘরে আটকা থাকবে খলবলানো জীবন্ত মাছ। আটকা থাকবে কিন্তু জলহীন হবে না। অর্থাৎ মারা যাবে না। কী অদ্ভুত, না? টাটকা মাছ ধরার লোভ সামলাতে পারল না অনেকেই।

দুই বছরের মালোর চব্বিশ বছরের মাও পারল না। বিধবা হলে মাছ খেতে নেই এ কথা সে বোঝে। কিন্তু তার জিহ্বা বোঝে না।

এক প্রহর রাতে ঘোমটা দেওয়া সাদা শাড়ি পরে যে ব্যক্তি এলো সে ঘুনির ধারে কাছে পৌঁছাতেই পারল না। তার যুবতী শরীরে যে কাঁচা মাংসের গন্ধ ভুরভুর করে, তার চলনে-বলনে-আঁখির-সঞ্চালনে, শরীরী কম্পনে আশেপাশে অনেক সিংহরা নিঃশব্দে, নীরবে ঘুরেছে আর উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করেছে। শরীরে তার কাঁচা মাংসের গন্ধ থাকলেও বুকে তার মাতৃদুগ্ধ! ঘাড়

কামড়িয়ে পাশের বাঁশ বাগানে নেবার সময় আক্রান্ত রক্তাক্ত যুবতী অনুরোধ করেছে- "মানষি কি কাঁচা মাংস খায়? বলোদিন! বুকি মোর পরানডা খাবলায়... ট্যার পাও না...!"

নাহ! পুরুষ মানুষ বুকের ভিতরের কথা শোনে না। একটুখানি ভালোবাসা কখনো গঙ্গা জলের মতো সব পবিত্র করে, তা বোঝে না পুরুষ মানুষ! তারা সমবেতভাবে বুকের মাংস খামচায়!

দুই প্রহর রাতে পাশের পাড়ার দুই ছিচকে চোর বেরিয়েছে ঘুনির মাছ চুরি করতে। ততক্ষণে ঘুনির মধ্যে হু হু করে অনেক জল ঢুকে গেছে। জল বেরিয়েও গেছে। কিন্তু মাছ বার হতে পারেনি। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দফায়ও জল ঢুকেছে। এখনো দফায় দফায় জল ঢুকছে। আর বেরচ্ছে। বিরামহীন। ভিতরে জমা হচ্ছে কিলবিলে মাছ। ছিচকে চোর দুজনের তাই আনন্দের সীমানা নেই। তারা আনন্দের আতিশয্যে হ্যাচকা টানে তুলে নেয় ঘুনি। তারপর খুশিতে ছুটতে থাকে। ঘুনি ভর্তি মাছ তড়পাচ্ছে জলের অভাবে ঘুনির পেটের ভিতরে। হঠাৎ একজনের কেমন সন্দেহ হলো। বাঁশবাগানে কীসের আওয়াজ? কেউ লুকিয়ে নজর রাখছে না তো! ঘুনিটা তারা সেইখানেই নামিয়ে রাখে। তারপর বাঁশবাগানের দিকে এগোতে থাকে। চুপিচুপি। কিন্তু শ্রাবণী আকাশ পুরো মাটিকে ভিজিয়ে নরম করে দিয়েছে। পা পাতলেই পা ডুবে যাচ্ছে মাখনের মতো পচাত পচাত করে। অতি সাবধানে কিছুটা এগুতেই গোঁঙানীর আওয়াজ পায় নারী কণ্ঠে...

"মানষি ককুনো কাঁচা মাংস খায়? মুই তো মরতিই চেইচি... একবারও তার খোঁজ নেলে না..., মোরে খুন করে ভূত বেনগে ছাড়লে...!"

দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ে। অলৌকিক ভয় দানা বাঁধা চোখ মুহূর্তে লোভমুক্ত! নির্জনে পড়ে রইল মাছভরা ঘুনি। তারা যতখানি সম্ভব নিঃশব্দে কেটে পড়ল।

পরদিন সকালে পাঁচু ঘুনি তুলতে এসে দেখে ঘুনি নেই! বৃষ্টি কমে গেলেও তখনো সরু নালা দিয়ে ক্ষীণ ধারায় জল প্রবাহিত হচ্ছে।

সে চিৎকার করে উঠল- "কোন্ ওলাওটা মোর ঘুনি নে গেচে রেতি?"

কোত্থাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। বেশ খানিক দূরে বাঁশবাগানে গাঁয়ের মানুষেরা জড়ো হয়ে কী করছে? পাঁচু এগিয়ে গেল। ঘুনি চোর ধরা পড়েছে কি?

পাড়ার অনন্ত মালোর বিধবা বউ। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, ব্লাউজ নেই গায়ে। পড়ে আছে সে মাটিতে। সারারাত ভিজেছে শরীরটা। ফর্সা চামড়া

ভিজে ফ্যাকাসে। ওঠার ক্ষমতা নেই। কিন্তু অল্প অল্প ওঠানামা করছে বুক।

মানুষগুলোর কৌতূহলের শেষ নেই। “এই বিস্টির মদ্যি বাইরে বেরগেচে কেন? বাঁশবাগানে আর কেডা কেডা ছেল? তার কি থালি কুনো দোষ নেই কো? একুন এরে নে কী করা উচিত? না, সোমসারে এরে ঢোকানি যাবে না কো!”

ভিড়ের মধ্যে ছিল কমলা মালো। সে বলে উঠল- “তোংগা কতা পরে হব্যানি। আপাতোক এরে মুই মোর ঘরে নে যাচ্চি...!”

পাঁচু বলে “কিন্তুক ও তো লষ্ট হই গেচ!”

কমলা ততক্ষণে ওর বুকে কান পেতেছে।

সে বলে- “তার দু বচরের ছাবালের ঝন্যি তার বুকির মদ্যি একুনো পরানডা ধুকপুক কত্তিচে...!”

কমলাকে ধরে ধরে উঠে পা বাড়াতে চেষ্টা করে বিধবা মালো। ঠিক তক্ষুনি চোর দুটো ছুট লাগায় সব্বার অলক্ষ্যে। ঘুনিটা ওখানেই আছে তো? পেট ভর্তি মাছ তার। কিছু হয়ত ততক্ষণে মারা গেছে! কিন্তু সব মাছ মরেনি! ওরা দৌড়তেই থাকে!

পা

১

মহাচন্দা এবং কালপুরুষ মর্ত্যে চলিতেছেন। তাঁহাদের স্কন্ধে গুরুতর দায়ভার পড়িয়াছে। একজন নারী তাহার মর্ত্যের কাল সমাপ্ত করিয়াছ। স্বয়ং যমরাজের আদেশানুক্রমে তাঁহারা চলিতেছেন। এই কর্ম তাঁহাদের নতুন নহে। বস্তুত যমরাজের আদেশ মান্য করিয়া মর্ত্য হইতে মৃত ব্যক্তিকে লইয়া আসাই তাঁহাদের প্রধান কর্ম। ইহার পূর্বেও এমন কার্য তাঁহারা দুই অনুচর মিলিয়া করিয়াছেন সুষ্ঠুভাবেই। কিন্তু আজিকার কর্ম শুরু করিবার অগ্রেই অনেক সমস্যার আগমন ঘটিয়াছে।

যে নারীর শরীর আনয়ন করিতে হইবে তাঁহার মর্ত্যের কাল তো অতিবাহিত হইবার আসন্ন কাল উপস্থিত হয় নাই। অথচ সেই নারী মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, তাহা নির্ণয় করাও নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পুণ্য কর্ম করিলে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। পাপ কর্মফলেই নরকে গমন করিতে হয়। ওই মনুষ্যটি তাঁহার পরিবারের ভিতরে অত্যন্ত গন্ডগোল শুরু হইবার একমাত্র কারণ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। অপরদিকে ওই নারী এবং একজন পুণ্যবান পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছে। যমরাজ ভালোবাসার নিমিত্ত কাহাকেও শাস্তি প্রদান করিতে রাজি নহেন। সমস্যাটা এই স্থানেই আসিয়া পড়িয়াছে। যমরাজের এই দুই অনুচর তাহা লইয়াই অত্যন্ত চিন্তিত রহিয়াছেন।

২

"বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছিস কী, পা ভেঙে খোঁড়া করে রেখে দেব!”

বলল সাগরের মা। মানে সৎ মা। সাগর ভয়ে চুপ করে থাকল। মা তার অন্যান্য অনেক সৎ মায়েদের মতই অত্যন্ত অসৎ ব্যক্তি। বাবা আছে সাগরের।

সাগরের নিজের বাবা এখন অসৎ বাবার মতো আচরণ করে সাগরের সাথে। সে তাই ভয়ে ভয়েই বাড়ির থেকে বেরনো একদম বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। সে বাড়ির সমস্ত কাজই মুখ বুজে করে যায়। খেতে না দিলে খায়ও না। চায়ও না। হাজার কষ্ট হলেও মুখ বন্ধ করেই রাখে। এবং চোখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। এখন কথা হচ্ছে কাউকে যদি কেউ একদিন ভালো না বাসে, একদিন হয়ত তার মানসিক পরিবর্তন আসতেও পারে। কিন্তু কেউ যদি কোনো মানুষের উপস্থিতিই সহ্য করতে না পারে, কেউ যদি কারো মৃত্যু কামনা করে তাহলে যতোই ভালো আচরণ তুমি করো না কেন, সেই মানুষটার মানসিকতার পরিবর্তন কখনোই হবে না। এটা বিশ্বাস করে সাগর কিন্তু তার মতো দুর্ভাগা মনে হয় পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এই ষোলো বছর বয়সেই সে তার মায়ের অন্তর্নিহিত ইচ্ছের কথা প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারে। অথচ ওর বাবা বোঝে না! কী অদ্ভুত লাগে সাগরের।

ছোটো বেলায় যদিওবা তাকে খানিকটা সহ্য করতে পারত তার মা মানে সৎ মা কিন্তু সে যত বড়ো হচ্ছে তত তার সৎ মায়ের কাছে সে অসহ্য হয়ে উঠছে। ঘুমের মধ্যেও সাগরের মনে হয় তার মা কটমট করে চেয়ে রয়েছে। সাগর ভয় পায়। কেঁপে ওঠে। মন-প্রাণ দিয়ে সে কোনো একজনের সাথে তার বিয়ে হয়ে যাক, এমনই কামনা করে সবসময়। তার বাবাও বলে- “সাগর মা, বাইরে বার হোস না। তোর মা’তো ঠিকই বলেছে। এই বয়সে বাইরে যেতে হয় না!” সাগর নালিশ জানাবার পথ পায় না। এভাবেই সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায় আগেভাগেই।

৩

মহাচন্দা কহিলেন- “দুশ্চিন্তা করিবার কারণ দেখিতেছি না। মর্ত্যলোক হইতে যমলোক ছিয়াশি হাজার যোজন দূরে অবস্থিত। পথিমধ্যে আমরা উহাদিগের নিকট হইতে সমস্ত তথ্য শ্রবণ করিয়া লইব।”

কালপুরুষ কহিলেন- “আপনি বোধহয় ভুলিতেছেন যে একজন নারী মৃত্যু বরণ করিয়াছে, যে একজন পুরুষকে যথার্থই ভালোবাসে। ভালোবাসিয়াই মেয়েটি মৃত্যুবরণ করিয়াছে। এমতাবস্থায় উহার নরকে কেমন করিয়া আনয়ন করিব ইহাই তো বুঝিতেছি না!”

কালপুরুষ মাথা নাড়াইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইত্যবসরে সেই স্থানে অকস্মাৎ “নারায়ন নারায়ন” এমন ধ্বনি উচ্চারিত হইল। উভয়েই চমকাইয়া উঠিয়া দেখিলেন সম্মুখে নারদ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

মহাচন্দ কহিলেন- “স্বর্গের দেব এই নরকে কী মনে করিয়া আসিয়াছেন, জানিতে পারি কি?”

কালপুরুষও নমস্কার করিয়া মহাচন্দের প্রশ্নের উত্তর পাইবার নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া চাহিলেন।

নারদ কহিলেন- “যেস্থানেই নারায়নের নাম লইব, সেই স্থানই পুজোর স্থান! সেই স্থানই পুণ্যভূমিতে পরিণত হইবে।”

কালপুরুষ কহিলেন- “আপনার আগমনের হেতু জানিবার অভিপ্রায় করিতেছি।” নারদ কহিলেন- “স্বর্গাপেক্ষা অধিক ভালোবাসিয়া মর্ত্যের কোনো নারী নাকি সময়ের অগ্রেই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তাহাকে চাক্ষুষ করিয়া স্বার্থক হইবার অভিলাশে আপনাদিগের সহিত মর্ত্যে গমন করিব এবং স্বয়ং নারায়নের অনুমতি লইয়াই আমি আসিয়াছি!”

৪

সাগর ভুল বুঝেছিল। অসহায় ভেবেছিল নিজেকে। তাই প্রতিবাদ করেনি কখনো। সে খুব সুন্দর। তার একজন বোন আছে সৎ মায়ের গর্ভে। প্রতি মুহূর্তে তার সাথে তুলনা করে তার সৎ মা। সাগর বাড়ির বাইরে তো বার হতই না। তবুও তার সৎ মা তাকে সহ্য করতে পারত না। বছর পাঁচেক আগে একটা অনুষ্ঠান বাড়িতে দেখা হয়েছিল তার সাথে মিহিরের। তখন তার মাত্র দশ-এগারো মতো বয়স। মিহির তখন পনেরো-ষোলো। এক মুহূর্তের মধ্যে দুজনে দুজনের চোখের তারার মিলনে এক হয়েছিল। সেই রাতেই মিহির তাকে সবার আড়ালে ছাদে নিয়ে গেছিল। আকাশে সেদিন জ্বলজ্বল করছিল কালপুরুষ। মিহির সেই দিকে চেয়ে সাগরের হাত ধরে বলেছিল- “কালপুরুষকে সাক্ষী রেখে তোমার পাণি গ্রহণ করলাম।” সাগর কিচ্ছু জবাব দিতে পারেনি।

তারপরও গ্রামের পথে দুই একবার দেখা হয়েছে। কথাও হয়েছে। কিন্তু চোখে চোখে।

এখন সাগরকে অনেকদিন বাইরে না দেখে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছে মিহির। সে একদিন সাগরদের বাড়িতে গেল। সবার সাথেই কথা বলল। আর একবার মাত্র সাগরের দিকে সে তাকিয়েছিল। মিহির ফিরে যাবার পর আচমকা সাগরকে ধরে উল্টোপাল্টা পেটাতে থাকে ওর মা। সেদিন সাগরের কী হয়েছিল তা সে জানে না। সেও রুখে দাঁড়িয়ে বলে ফেলেছিল- “মারবে না আমাকে একদম।”

জবাবে তার মা আরো জোরে এলোপাতাড়ি মারতে মারতে বলেছিল- “প্রেম করিস তুই ওই ছেলের সাথে? বল, ও তোকে কী ইশারা করল। বল, ও কেন এসেছিল আমাদের বাড়িতে?”

সাগর ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল সৎ মাকে। মুখ থুবড়ে পড়েছিল তার সৎ মা এবং সেখান থেকে উঠে দরজার খিল তুলে নিয়েছিল হাতে। সাগর সারাজীবন ধরে ভেবেই যাচ্ছে ওর পা দুটো কী ক্ষতি করেছে ওর মায়ের? কথায় কথায় ও সারা জীবন বলেছে যে, “কোথাও গেলে পা ভেঙে দেবে।” আজ সেই পায়েই মা একের পর এক বাড়ি মেরে গেল।

তখন অনেক রাত। যে পা ভাঙার ভয়ে সে বাইরে বার হয়নি, আজ সেই ভয়কে দুই হাতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সে বাইরে বের হলো। কিন্তু পা হারানোর পর। রাতের অন্ধকারে কোথায় সে যাবে ভাবতে ভাবতে শ্মশানের দিকে হাঁটল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে সাগর। বেদম ব্যথা তাঁর বাঁ পায়ে। ব্যথার টানেই মনে হয় গায়ে জ্বর উঠে গেছে তার। সেই অবস্থায় শ্মশানে পৌঁছে সে ঘাটের কাছে গেল। পায়ে রক্ত জমে আছে। পুকুরের ভিতরে পা ডুবিয়ে সেখানে সেই ঘাটের উপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সাগর। একজন মানুষও তার পাশে নেই আজ। বাবাকে সে ফোন করেছিল ওইভাবে মা মারার পর। বাবা বলেছিল- “তুই বাইরে বেরিয়েছিলিস কেন? তোর মা তো আগেই মানা করেছে!”

সাগর যত বলতে যায় যে সে বাইরে যায়নি। ততই বাবা তার সম্পর্কে আজেবাজে মিথ্যে কথা বলতে থাকে। ওই ছেলের সাথে কোথায় যেন সে ঘুরতে গেছিল। এইসব বলেছে তার মা, তার বাবাকে। সাগর সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভীর রাতে সে বাড়ি থেকে পালাবে। কিন্তু কোথায় যে যাবে! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সাগর শ্মশানেই এসেছে। সে তো মৃতই। শুধু তার কোনো শ্মশানযাত্রী নেই। যার মা না থাকে তার কপাল মনে হয় এমনই হয়।

সাগর ঘাটের সিঁড়িতে বসে কাঁদছিল। জলের ভিতরে সে তার পা দুটো ডুবিয়ে রেখেছিল। তারপর অসহায় মেয়েটা কখন যেন মড়ার মতই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী জানি হয়ত সে মারাই গেছিল।

৫

গ্রিক দেবী আর্তেমিস গ্রিক শিকারি ওরিয়নকে ভালোবাসিয়াছিলেন তাঁহার পৌরুষ এবং সরলতা লক্ষ্য করিয়া। তাঁহারা মর্ত্যের কাল সমাপ্ত হইলে একত্র বসবাসের আন্তরিক কামনা লইয়া সতের হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই আকাশে

প্রেমের প্রতীক স্বরূপ জ্বলজ্বল করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদেরকেই সাক্ষী রাখিয়াছিল মর্ত্যের দুইজন সহজ-সরল মানুষ। এক্ষণে সাগরের মৃতবৎ পড়িয়া থাকা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। গ্রিক দেবী আর্তেমিস তখনি যমরাজকে খবর পাঠাইয়াছেন। তিনিই যমরাজকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যমরাজই সাবিত্রীর একান্ত ভালোবাসায় মুগ্ধ হইয়া মৃত সত্যবানকে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। যমরাজ গ্রিক দেবী আর্তেমিসের অনুরোধক্রমেই তাঁহার দুই অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা শ্মশানে বেচারা সাগরের মৃত দেহের সম্মুখে দণ্ডায়মান। একটি ষোলো বছরের নিষ্পাপ কিশোরী চন্দ্রালোকে শায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর দেহখানি দেখিয়া দুই অনুচর চাহিয়া রহিলেন। তাহার শরীর ছাড়িয়া তাহার ঈশ্বরতুল্য আত্মা তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি দৃশ্যের বিবরণ বর্ণনা করিলেন কালপুরুষ এবং মহাচন্দা। যমরাজ আত্মাকে আদেশ করিলেন ওই শরীরে পুনঃরায় প্রবেশ করিতে। কিন্তু আত্মা কহিল যে সে মিহিরের নিবেদন ব্যতীত ওই শরীরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না।

উপসংহার:

সাগর যখন এই পুকুরের সিঁড়িতে বসেছিল, তখন তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল এই পুকুরের জলে মিশে গেছিল। তারা এখন এই পুকুরের উপর থেকে বয়ে যাওয়া বাতাসকে ফিশফিশ করে মিহিরের বাড়ির জানালার ঠিকানাটা দিল। বাতাস যমরাজকে আশ্বস্ত করল। এবং হু হু করে ছুটে চলল। মিহির জানালায় টোকা শুনল। সাগর ডাকল তাও শুনল। সে নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো শ্মশানে এলো। দেখল শ্মশানের ঘাটে ওইভাবে পড়ে আছে তার প্রেমিকা। মিহির সাগরের পা দুটো অত্যন্ত ভালোবেসে তুলে নিল কোলের উপর। বাতাস জোরে জোরে বয়ে গেল। ভিজে পা শুকনো হয়ে উঠল। মিহির যেন জানত। যেন ভেবেছিল এমনই হবে। সে তার পকেটে হাত দিল। দুটি নূপুর ঝিকমিক করে উঠল চাঁদের আলোয়। মিহির পায়ে পরিয়ে দিতেই সাগর জোরে নিঃশ্বাস নিল। যেন ঘুম ভাঙল তার। যেন এই ভালোবাসাটুকুই তার সোনার কাঠি। মিহির অনিন্দ্যসুন্দর সেই নূপুর পরা পায়ে চুমু খেল। আকাশে-বাতাসে-স্বর্গে-মর্ত্যে কে যেন বলে উঠল- “দেহি পদপল্লভমুদারম"।

কথা দেওয়া না দেওয়া

তখন সত্যযুগ। তখন জনক রাজা চাষ করছিলেন। একটি সুন্দর দেখতে মেয়ের কলিযুগে জন্মাবার কথা ছিল। কিন্তু চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-তারার প্রভাবে মেয়েটি রামায়ণের যুগে জন্মগ্রহণ করল। মেয়েটি জানত না যে সে সুন্দর কী না! কখনো পুকুরের জলে গিয়েও সে তার মুখ দেখেনি। কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা বলে যে, সে খুব সুন্দর! তার চোখে নাকি ময়ূর পেখম তোলে। তার ঠোঁটে প্রজাপতি ডানা মেলে। মেয়েটার নাম স্নিগ্ধা। স্নিগ্ধা এসব শুনে অনেক ভেবেছে। আকাশে মেঘ দেখলেই চেয়ে থেকেছে। সে প্রমাণ করতে চেয়েছে নিজেকে। আকাশে মেঘ করলে নির্নিমেষ চেয়ে থেকেছে সেই কারণেই। কখনো ময়ূরের মতো নেচে তো ওঠেনি ওর চোখ! তবে কি ওর চোখ মিথ্যা? নাকি তাকে যারা দেখে তাদের চোখ মিথ্যা? বড্ড ধন্ধে থাকে স্নিগ্ধা। মাটির গভীরে শিকড় প্রবেশ করিয়ে যে সব গাছেরা শক্তি সঞ্চয় করে এবং মাটির উপরে সুন্দর ডালের মাথায় ছোট্ট দুটো পাতার মাঝে আরো সুন্দর ফুল ফুটিয়ে থাকে, তাদের রেণু মেখেছে সে তার সারা গায়ে। তারপর ভেবেছে সেকি সত্যিই তাই, যা অন্যেরা বলে? ঠোঁট যদি প্রজাপতি হয়, তবে রেণু মাখলে সুখ কেন হয় না? কোথায় মিলনের অভাব তার? ঠিক কোন বৃক্ষের মূলে? মাটির কোন সে অন্তিম কোণে? ভাবতে ভাবতে দিশাহারা সে। ঠিক সেই সময় সেই সমস্ত চোখের অধিকারীদের মধ্যেই একজন যার নাম মানিক, সে এসে স্নিগ্ধার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলে “স্নিগ্ধা, তোমাকে ভালোবাসি!”

স্নিগ্ধা বলে- “কেন ভালোবাসেন?”

মানিক বলে- “তোমার চোখ দুটোতে ময়ূর পেখম, হাত দুটোতে বন্ধুত্বের আহ্বান, ঠোঁট দুটোতে...!”

স্নিগ্ধা রোমাঞ্চিত হলো। বলল- “আমি ভালোবাসা ঠিকঠাক চিনি না। তবে

বড্ড রোমাঞ্চিত হচ্ছি।”

মানিক বলল- “এইটাই ভালোবাসা!”

স্নিগ্ধা বলল- “তাহলে আমিও তোমাকে ভালোবাসি!”

মানিক বলল- “কথা দাও, আর কাউকে কোনোদিন ভালোবাসবে না! কথা দাও আমাকে কোনোদিন ভুলে যাবে না!”

স্নিগ্ধা কথা দিল।

স্নিগ্ধা আর মানিক প্রেম করতে আরম্ভ করল আর জনক রাজা হালের মাথায় একটা সুদৃশ্য বাক্স পেলেন। বাক্স খুলে পৃথিবীর কন্যা সীতাকে পেয়ে গেলেন। খুশিতে নাচতে নাচতে তিনি সীতাকে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসতে বাসতে বড়ো করে তুলতে লাগলেন।

বাল্মিকী রামায়ণে যেমন যেমন লিখলেন, পৃথিবীতে সীতার সাথেও তেমন তেমন হতে লাগল। কিন্তু স্নিগ্ধার জীবন কোনো রামায়ণে লিখল না। তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠতে লাগল সে। যেদিন রাম হরধনু ভেঙে সীতাকে বিয়ে করলেন সেইদিন আবীর স্নিগ্ধাকে প্রোপোজ করল। এখন স্নিগ্ধা জিজ্ঞাসা করল- “কেন ভালোবাসেন আমাকে?”

আবীর নিরুত্তর রইল। তখন স্নিগ্ধার মনে অনেক কথাদের ফুল ফুটে উঠল। স্নিগ্ধা তার কোনো জবাব পেল না। তাই যে জবাবটা তার হাতে ছিল, সেইটাই জানিয়ে দিল। বলল- “স্যরি, আমি বাগদত্তা!”

আবীরের যন্ত্রণা দ্বিগুন হলো। বিষণ্নতায় এমনভাবে আক্রান্ত হলো, যে তার মানসিক অবসন্নতা তার শরীরকেও গ্রাস করল। যেমন বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ, চোখের মধ্যে করকর। আবীর সহ্য করে নিল। উপায় তো নেই। দাঁতে দাঁত চেপে আবীর সহ্য করে নিল সমস্তটুক। কিন্তু এই সময়েই অদ্ভুতভাবে তার বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী পরস্পর ঝগড়া করতে আরম্ভ করল। আবীর অবাক হয়ে দুই জনের দিকে চেয়েই রইল। সেকী ঝগড়া! এ ওকে কিছু বলে তো, ও তেড়ে আসে। বিপরীত দিকেও একই সমস্যা। আবীর অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। না পেরে একসময় প্রতিবাদ করল। “তোমরা যা করছ তাকে অসভ্যতা বলে।” কেউ আবীরকে পাত্তাই দিল না। আবীরের ঠিক তখনি নিজের বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ এলো। শরীরের মধ্যে অনেকগুলোই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে। মনের বিষণ্নতা যদি এভাবে শরীরকে প্রভাবান্বিত করে,

তাহলে শুধুমাত্র বুড়ো আর তর্জনী কেন? অন্য কোথাও কেন প্রভাব পড়েনি! আবীর বুঝতেও পারেনি তার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে কেটে গেছে ত্রেতা যুগ।

দ্বাপর যুগে এসে হঠাৎ বুড়ো আর তর্জনীর একে অপরের সাথে ভাব হয়ে গেল। দুজনে দুজনকে কত্তো ভালোবাসার কথা বলছে। কবিতা লিখছে। চাঁদ, তারা। গান গাইছে। গানের সুরে ভাসিয়ে দিচ্ছে প্রেম বোধ। সেই বোধে ভেসে যাচ্ছে আবীরের ইহকাল। ভাসছে পরকাল। সুখের আর স্বপ্নের দোলাচলে খুশি হয়ে উঠল আবীর। সে জানে জনক রাজার কালে যে তাকে অস্বীকার করেছিল, তার অস্তিত্ব এই দ্বাপর যুগে অসম্ভব। তবুও আবীর খুঁজতে লাগল। ওকে তার চাইই চাই। সেই সময় হঠাৎ বুড়ো আঙুল তর্জনীকে শব্দ করে চুক চুক করে চুমু খেল। বিনিময়ে তর্জনী বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরল।

আবীরের খুব রাগ হয়ে গেল। এরা দুজনেই অসভ্য। স্বাধীনচেতা!

আবীর বলল- "কী ভেবেছো তোমরা যা খুশি তাই করবে? মোটেও নয়! আমি নিষেধ করছি। তোমরা আমার অঙ্গ। আমার কথা তোমাদের কাছে বেদবাক্য! দেখি কেমন করে তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করো!"

বলতেই কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! দুজনে গলা জড়িয়ে ফিশফিশ করে কত কিছুই যেন বলল। তারপর নতুন বিবাহিত দম্পত্তির মতো মিষ্টি হাসতে হাসতে কুটুশ করে কামড়ে দিল আবীরকে! রাস্তার মধ্যে হঠাৎ এমন আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না আবীর! সে চমকে উঠে বলল- "এটা কী হলো? কামড়ালে কেন আমাকে?"

বুড়ো আঙুল বলল- "কোথায় কামড়িয়েছি?"

তর্জনী বলল- "আমাদের দাঁত নেই। আমরা নিরামিষ। যা করেছি তাকে চিমটি কাটা বলে।"

আবীর বলল- "তোমরা সৃষ্টি হয়েছো আমার কথা শোনার জন্য! অথচ তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছো! আমার অনুমতি ছাড়া ঝগড়া করেছো, মারপিঠ করেছো এবং এখন অন্যায়ভাবে আমাকে চিমটি কেটেছো!"

বৃদ্ধ এবং তর্জনীর এখন গলায় গলায় ভাব। দুজনে দুজনকে চুমু খাচ্ছে। আদর করছে।

আবীর বুঝতে পারছে না তার এখন কী করা উচিত। দুজনকে পাত্তা না দিলেই তো হয়! কিন্তু ওরা দুজন যে ওরই শরীরের অঙ্গ। নিজেরই শরীরের অঙ্গ যদি অবাধ্য হয় তাহলে অঙ্গহীন হওয়াই তো ভালো!

ওদের ঝগড়া মিটে যেতে যেতে দ্বাপর যুগের কাল পার হয়ে গেল।

এখন কলিকাল। এখন স্নিগ্ধা আবীরের সামনে এসেছে। এখন তার চোখে সত্য ভাষা খুঁজে পেয়েছে। এখন সে জানে ভালোবাসার আসলে কোনো রূপ হয় না। ভালোবাসার আসলে কোনো কারণ থাকে না। তার চোখ সেই কবে কোন কালে, যখন সীতা পাতালে প্রবেশ করেছিল, সেই থেকে আবীরকে খুঁজে চলেছে। আজ পেয়েছে। আজ সে আবীরময়। এখন সে আবীরকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে চাইল।

আবীর বিশ্বাস করল না।

স্নিগ্ধা হাত বাড়িয়ে দিল। আবীরও নিজের হাতে স্নিগ্ধার হাত ধরতে চাইল। বিশ্বাস করতে চাইল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মাঝের সেই রত্ন এবং রত্নের চিন্তা তাদের এক হতে দিল না। তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে আবীর তার নিজের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চাইল। অনুরোধ করল বিশেষভাবে বুড়ো আর তর্জনীকে। একটা চিমটি কাটার জন্যে। কিন্তু তখন তাদের আবার ঝগড়া চলছে। এই সময় তাদের বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়। তাই বুড়ো আর তর্জনীকে আবীর হাজার অনুরোধ করলেও তারা চিমটি কাটল না। একটা ছোট্ট চিমটির অভাবে যুগ যুগ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবীর। আজও সে তার দয়িতাকে কথা দিতে পারেনি।

চাঁদের কলম

বিক্রম থ্রি চাঁদের বুকে একটা কলম খুঁজে পেয়েছে। কলমটা বহু বছরের পুরানো। কোনো একটা ধাতু দিয়ে তৈরি । চাঁদের মাটিতে অনেক রকমের ধাতু পাওয়া গেছে। কলমটা যে ধাতু দিয়ে তৈরি তা ওই সমস্ত ধাতুর থেকে আলাদা। এই কলমটা পৃথিবীতে আনার পর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কলমটা আগুনে পুড়ছে না। জলে ভিজছে না। রঙ লাগছে না কলমের শরীরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। অথচ দিনের বেলায় সে জ্বলছেও না কিংবা সূর্যের আলোও তার গায়ে লাগছে না। বিজ্ঞানীরা কলমটা নিয়ে নানারকমভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। যে ধাতু দিয়ে কলমটা তৈরি তার অস্তিত্বের খোঁজ চলছে। চাঁদের মাটিতে সোডিয়াম, সালফার, লোহা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কিন্তু এই কলমটি যে ধাতু দিয়ে বানানো তা চাঁদেও নেই, পৃথিবীতেও নেই। ডট নয়, ফাউন্টেন। কলমটি কোন্ ধাতুতে তৈরি তার মীমাংসা ভবিষ্যতের বুকে রেখে আপাতত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কলমটা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বর্তমান যুগে ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করেন না কেউ। তাই কালিও আর পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন করে কালি তৈরি করা হলো কলমটা ব্যবহার করার জন্য। দামি ডাই এবং পিগমেন্ট আনা হলো। কালি তৈরি করার জন্য জল, তেল এবং এলকোহলও মেশানো হলো। কালি তৈরিও হলো চমৎকার। উজ্জ্বল রঙ। মনভোলানো সুন্দর গন্ধও ব্যবহার করা হলো। অন্য কলমে ভরে লেখা হলো। কাগজের উপর যেন সোনার ছাপ পড়ছে। কী যে মিষ্টি রঙ হয়েছে! খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আজকাল আর অন্য কোনো সংবাদ বা ছবি নেই। টিভির পর্দায় এখন একটাই খবর। ফেসবুক, ট্যুইটার, ইন্সটাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ সর্বত্র একটা কলমের ছবি। মানুষ আজকাল কলম নিয়ে রিসার্চ করছে। প্রতিদিন সূর্য উঠছেই যেন কলমটাকে দেখবে বলে! এত এত মানুষের কামনাকে এক ফুয়ে প্রদীপ নেভাবার মতো আশাহত করল কলমটা। কালি

তার শরীরে প্রবেশ করানোই যাচ্ছে না। কী অদ্ভুতভাবে সমস্ত কালিই বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমনভাবে বার হচ্ছে যেন কলমের গর্ভ ভর্তি হয়ে গিয়ে অতিরিক্ত কালি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ ভিতর তখনো একদম খটখটে। একবার দুবার নয়। বারবার কালি ভরার চেষ্টা করা হলো আর বারবার ব্যর্থ হলো সব্বাই।

সংবাদ মাধ্যমে সেই ভিডিও প্রকাশ হতেই তোলপাড় হয়ে গেল পৃথিবী। আমেরিকানরা সরাসরি কলমটা কত টাকায় বিক্রয় করা হবে তা জানতে চাইলেন। ভারতীয়রা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে এই কলম বিক্রয়যোগ্য নয়। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা হলো। নতুন করে সাজানো হলো সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি স্তম্ভকে। শিক্ষাখাতেও বরাদ্দ হলো অনেক বেশি অর্থ, যাতে বিশ্বের বাজারে ভারতীয়রা উন্নততর শিক্ষক তথা সুবিবেচক বন্ধু, স্বামী, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার এবং অতি অবশ্যই বিজ্ঞানীর পরিচয় দিতে পারেন।

ভারতীয় সংবাদ বিদেশে আর সহজলভ্য থাকল না। যে কেউই ইচ্ছা করলেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্থাৎ ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছামতো সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারছেন না আর।

সমস্ত ভারতীয়রা বিশ্বের দরবারে অত্যন্ত সম্মানীয় বলে বিবেচিত হতে লাগলেন। বিশ্বের উন্নততম দেশিগুলোতে ভারতীয়দের মধ্যে যে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তার জন্য মুহূর্তের মধ্যে স্কুল-কলেজ নির্মিত হয়ে গেল। ভারতের মোট বাইশটি সাংবিধানিক ভাষার স্কুল তৈরি হয়ে গেল অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে। সেইসব দেশে ভারতীয় জনগণকে অধিক অর্থ প্রদান করে চাকরির সুযোগ দেওয়া হলো। কলমটা যেহেতু কলকাতার বাঙালি বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন চাঁদে, তাই বাংলা ভাষা বিশ্বের সর্বপ্রথম শিক্ষিত মানুষদের আদরের এবং সম্মানের ভাষা হয়ে উঠল। এই সমস্ত কিছু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ে গেল। ভারতীয়দের মধ্যে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণ এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেল যে দেশের বিচার-ব্যবস্থা, জেল ইত্যাদি উঠে গেল।

এখনও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। সততার দ্বন্দ্ব। কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর থেকে বা ভাই-বোনের থেকে আরো সৎ হতে পারবে তার যেন এক অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। পৃথিবী ভারতবাসীকে ধন্য ধন্য করছে। বাঙালি এক বিশাল উচ্চতায় উঠে গেল সম্মানে আর শ্রদ্ধায় শুধুমাত্র একটা অন্যরকম কলমের জন্য। কিন্তু আফশোস কলমটাতে এক বিন্দুও কালি প্রবেশ করানো

যাচ্ছে না! সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে বিশ্বাস এবং একতার পরিমাণ যখন আকাশ ছুঁয়ে দিল সেই সময় আবার একদিন কলমটাকে বার করা হলো। দেশের সমস্ত জনগণ তখন এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণ গেলেও দেশের সম্পদ যে কলম তাকে বিদেশের বাজারে সস্তা করার মতো ভারতবাসী তখন জাদুঘরে চলে গেছে। সব্বাই দেখতে চাইল সেই সময় কলমটাকে আবার। সবার কথা ভেবে পরদিন বিভিন্ন সংবাদ পত্রে কলমটির ছবি দেওয়া হলো।

কলমের এয়ারটাইভের মাথায় একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এই কলমটারও ছিল। সমস্ত সংবাদপত্রেই সেই ছিদ্র থেকে গরম জল বেরতে থাকে। পুরো ভারতবাসী অবাক হয়ে সেই ছবির দিকে চেয়ে রইল। যখনি কেউ সংবাদপত্র পড়তে যাচ্ছেন, কাগজ ভিজে যাচ্ছে গরম জলে। জলটা ছবির কলমের সেই ছিদ্র থেকেই বার হচ্ছে! মানুষ ফুঁপিয়ে কাঁদলে যেমন আওয়াজ হয়, কেউ কেউ সেইরকম শব্দ পেলেন। কেউ কেউ বললেন, এ যেন স্বপ্ন-ভাঙা কোনো ঈশ্বরের অশ্রু! ভারতবাসীর মন আশঙ্কায় পূর্ণ হলে পর সবাই বুঝতে পারলেন যে কলমটার প্রাণ আছে এবং তার সাথে কথা বললে সে কী চায় তা অবশ্যই জানা যাবে। পরদিন পুজোর ঘরে যেমন পবিত্র আসন পেতে, ফুল, গঙ্গাজল, ধূপ, ধুনো দিয়ে পুজো করা হয়, ঠিক তেমনভাবে নৈবেদ্য সাজানো হলো। একশত ভাগ ভারতবাসী টিভি বা মোবাইলের লিংকে ক্লিক করে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছেন। কলম দেবীকে আনা হবে পুজোর বেদিতে। কিন্তু অনেক দেরি হচ্ছে কেন আসতে! কলম রাখা ছিল সরকারি কোষাগারের লকারে। তালা লাগানো। চাবি দিয়ে তালা খুলে দেখা গেল লকার শূন্য। কোনোদিন এখানে কোনো কলম ছিল বলেই মনে হচ্ছে না। তার বদলে সেখানে রয়েছে একটা চিঠি। চিঠিটার কালির এমন রঙ আগে কখনো কেউ দেখেনি। মনে হচ্ছে রামধনু আকাশ থেকে নেমে এসে তার রঙ দিয়ে লিখে গেছে এই চিঠি। চিঠিতে লেখা:

“মূর্খ ভারতবাসী, আমি তোদেরই ছিলাম। ১৯১৩ সালের পর তোদের মধ্যে এমন সাধনা করার মতো আর কেউই নেই। ব্যবহার করা না হলে আমার খিদে পায় না। আর খিদে না পেলে পৃথিবীতে থেকে কোনো লাভ নেই। চাঁদের বুকে আবারো পড়ে থাকি কয়েক শতাব্দী। সাধনা কর। নিজেই আসব। সাধনা ভিন্ন আমার কোনো অস্তিত্ব নেই।”

স্বপ্ন ভাঙা মূর্খ ভারতবাসীর চোখ থেকে মোটা মোটা ফোঁটায় গরম জল পড়তে লাগল।

ইলিশ মাছের ঝোল এবং এক বর্ষার ভোর

রোহিত হঠাৎ ঋত্বিকের গলা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর। মানসিকভাবে তৈরি না থাকায় বন্ধুর দিক থেকে এমন আচমকা শত্রুতাপূর্ণ আক্রমণে শক্ত প্ল্যাটফর্মে ধপাস করে পড়ে যায় ঋত্বিক। তারপর সেও আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। এখন দুইজনেই হয় জীবন, না হয় মরণ এই ভঙ্গিমায় আক্রমণ করেছে দুইজনকে! অথচ ওরা দুজন বন্ধু ছিল। আজ এই ভোরের আগে পর্যন্ত।

গত তিন দিন ধরে বৃষ্টির বিরাম নেই। অন্য সময় হলে কাচ্চা বাচ্চাগুলো এদিক ওদিক কাজে যেত। কিন্তু এই নিম্নচাপে কেউই কোত্থাও যেতে পারছে না।

দুইজনে তখন জড়াজড়ি করে মারামারি করছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে একে অপরকে মারছে। নোখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে চোখে। ঋত্বিক মুখ সরিয়ে নিল। তার আগেই চোখের ভিতরে নোখের আঘাত লেগে গেছে তার। ঋত্বিক আরো জেদি হয়ে উঠল যেন। নাক-মুখ জড়িয়ে রোহিতকে ঘুষি মারল। যদিও হাত বেশি উঁচু না হবার কারণে মনের মতো জোরে মারা যায়নি, তবুও মারাত্মকই জখম হয়েছে রোহিত। সে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় কয়েক সেকেন্ড নিজের মুখ এবং দাঁত দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের কারণে একটু শিথিল হয়েছিল। সেই মুহূর্তটুকই একজন প্রাণ নিয়ে নেবার মতো রাগি ব্যক্তির কাছে যথেষ্ট সময়। ঋত্বিক যেহেতু নিজে চোখে আঘাত পেয়েছে, তাই সমান আঘাতের ইচ্ছে নিয়ে সে তার সরু আঙুল ঢুকিয়ে দেয় রোহিতের নাকের ভিতর! খামচি কেটে ধরে। নাকের থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে।

পাশেই মাস ছয়েকের বাচ্চাটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় একগাদা পাতলা পায়খানা করে রেখেছিল, অনেকক্ষণ পরে তার মা বাচ্চাটাকে তুলে প্ল্যাটফর্মের টাইম

কলে ধোয়াতে নিয়ে যায়। আসলে এই লাগাতার বর্ষায় কেউই কাম-ধান্ধায় বেরতে পারেনি। কিন্তু পেট তো নিম্নচাপ বোঝে না। আশেপাশের কচুঘেঁচু দিয়ে চলছে এই কদিন। আকাশটা একটু ধরলে সব বাবু-বিবিরা কাম-কাজে বেরোবে। তখন সারাদিনে ভিক্ষে করেও একমুঠো চাল পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু এখন সবার পেটে বড়ো খিদে। কোনোরকমে একটু চাল ফুটিয়ে নুন লংকা দিয়েই খাচ্ছে সবাই। গড়াতে গড়াতে দুইজনে সেই বাচ্চাটার গু মাখানো কাঁথাকানিখানির উপর পড়েও গড়ায়। দুইজনেরই সারা গায়ে গু মাখামাখি হয়ে যায়। সব্বাই চিৎকার করে জানান দেয় ব্যাপারটা। কিন্তু তবুও কেউই ছাড়ে না কাউকে!

জগার বউ বলে যে সে জানে কী হয়েছে!

রোহিত কিছুতেই বাগে পাচ্ছে না ঋত্বিকের গলাটা। “শালা তোকে গলা টিপে মেরেই ফেলব!” মনে মনে সে বলছে। ঋত্বিকও একই কথা বলছে।

জগার বউ বলে- “আরে বিস্টির পেত্থম দিন থে রোহিত পেত্যেক দিন ইলিশের ঝোল দে ভাত খাচ্চেলো!”

সবাই বলে যে সবাই সেটা জানে। কারণ সবাইই ইলিশ রান্নার গন্ধও পেয়েছে। মনে সবার এই প্রশ্ন এসেছিল যে কত মাছ কিনেছে যে প্রতিদিন দুবেলা ইলিশের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছে? কেউই কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি যদিও।

জগার বউ হাসে। বলে- “মুই রোজ দেকিচি। সে কতটা ইলিশ মাচ এনেচে!”

জগা আর জগার বউ থাকে রোহিতের বাসস্থানের মাথার কাছে। ওইদিকটা অনেকটা খোলা। অন্যদিকে কাঠের পাটাতন এবং ছেঁড়া শাড়ি টাড়ি দিয়ে ঘেরা।

সব্বার যে বিষয়টা জানার একান্ত ইচ্ছে ছিল, তার উত্তর জানে জগার বউ! উৎকর্ণ হলো সবাই! “কতডা বলোদিন!” জগার বউ তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে- “আরে! দুরোহ! কতডা ইলিশ শোনবা? এক পিস! তাও ল্যাজার গোঁড়ার থে!” তারপর হাত উঁচু করে সাইজ দেখায়!

"এই এট্টুসকানি!” সবাই বলে “কিন্তুক রোহিত দোবেলা ইলিশের ঝোল দে ভাত খেতো! রান্নাও করত ইলিশ। আমরা সব মাচের গন্দ পেইচি!”

জগার বউ বলে- “তা যুক্তি দে ঠিকই বলেচে। ইলিশের টুকরোটা দিয়ে ঝোল রেঁদে খালি ঝোলটা খেয়ে মাচটা রেকে দেচে। রোজ! মুই নিজি দেকিচি!” বলে জগার বউ হাসে। সেও এই বর্ষাতেই শুধু নয়, কত কত বর্ষায় সে নিজে

ইলিশ খায়নি। কোলের ছেলেটারে দিতে পারেনি। মনে মনে এক তুমুল ঈর্ষায় জ্বলেছে সেও। অন্যদের মতো। রোহিত ইলিশ খায়নি রোজ। এক পিস পেয়েছিল কোথাও থেকে। হয়তো স্টেশানের কাছের বাজারে কোনো দোকানে কাজ করে দিয়েছিল, তার বিনিময়ে। চুরি করাও অসম্ভব নয়! কিন্তু সে যে মাত্র এক পিস মাছ এনেছে এবং দুই দিন ধরে ওইটাকেই রোজ ফুটিয়ে ফুটিয়ে খালি ঝোল খেয়েছে, এই সংবাদ জানার পরও মানুষগুলোর জ্বলন কমে না!

প্ল্যাটফর্মে থাকা মানুষগুলোর আকৃতি মানুষের মতই। কেন না, মানুষের ঔরসে এবং মানুষের পেটেই তাদের জন্ম। জন্মের পর পথের ঘেয়ো কুকুরের মতো খাদ্যের সন্ধান করে এরা। ভাদ্র মাসের কুকুরের সাথে এদের পার্থক্য খালি রাত আর দিনে। তল পেটের নীচের চাইতে তলপেটের উপরের খিদে এদের বেশি জানান দেয়। এই প্ল্যাটফর্মের মহিলারা উপরের পেটের চাহিদা মেটাতে তল পেটের নিচটাকে ব্যবহার করে। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, বন্ধু-শত্রু সব একাকার হয়ে পাক খায়, যেমন এখনো পাক খাচ্ছে জন্ম থেকে বন্ধু হওয়া দুজন ব্যক্তি!

কী কারণে এই প্রাণান্তকর লড়াই! জগার বউ বলে, যে, সে জানে কী হয়েছে। বলে- “ত্যাকোন তোমরা ওটোনি ঘুমিত্তে! ঋত্বিক উঠে ঘুমন্ত রোহিতের হেসেল তল্লাশ কত্তেলো! রোহিতের ঘুম ভেঙে যায়। সে বলে ওঠে- “হেই কেডারে?”

ঋত্বিক এক গাল হেসে বলে- “মুই খাচ্চিনে তোর ইলিশ মাচ। একবার চোকের দেকা দেকতুম। কতডা ইলিশ এনিচিস তুই? রোজ দোবেলা ইলিশ দে ভাত খাচ্চিস!”

রোহিত লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। লুঙ্গি খুলে যায় তার। তাড়াতাড়ি লুঙ্গি বাঁধতে বাঁধতে কড়াইয়ের দিকে চেয়ে দেখে ঢাকনাটা পাশে পড়ে আছে। আর কড়াই খালি। সেখানে তার প্রার্থিত মাছের টুকরোটা নেই! সেই মুহূর্তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঋত্বিকের উপর। ঋত্বিক টাল সামলাতে পারে না। পড়ে যায় প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে। ব্যাস এই হলো সাপের মতো জড়াজড়ি করে মারামারি শুরু হবার কাহিনি।

ইতিমধ্যে হাঁফিয়ে গেছে দুজনেই। যে-ই সুযোগ পাচ্ছে পা দিয়ে সজোরে অন্যকে লাথি কষাচ্ছে। অনেকগুলো হাড় জিরজিরে বাচ্চা আছে এই প্ল্যাটফর্মে। তারা বাস্তব জীবনের নির্দয় কাঠিন্যকে ভুলতে নিজেদের সবসময় রঙিন পৃথিবীর হিরো ভাবে। ভাবে এখন তারা সাইড রোলে আছে। অচিরেই তারা একদম

শাহরুখ খানের মতো হিরো হয়ে যাবে। শাহরুখ তো সিনেমার হিরো, তারা প্রত্যেকেই ভাবে যে তারা বাস্তবের হিরো হয়ে সব অন্যায়ের বদলা নেবে। কেন তাদের বাড়ি-ঘর নেই, কেন নেই বাবা...! এই সমস্ত কিছুরই বদলা নেবে তারা। তাদের চিন্তাটা যে এমনই তা তাদের আট বছর বয়সেই বিড়ি টানা বা আঠা শুঁকে নেশা করা এবং গলায় কালো কার বা চুলের স্টাইলেও ধরা পড়ে। ধরা পড়ে এদের নামকরণেও। ধরা পড়ে এইরকম প্রাণান্তকর মারপিটের সময়েও হাত তালি দেওয়া দেখে। আট বছরের আরো এক হিরো হঠাৎ বলে ওঠে- "শালা অনেকক্ষণ থে মুত লেগেচ। মুতে আসি দাঁড়া।"

বলে একটু পাশে গিয়ে প্যান্ট খুলে কড়ে আঙুলের মতো এইটুকুনি ইয়ে বার করে ছ্যারছ্যার করে লাইনের উপর হিসি করতে থাকে। ঠিক সেই সময় জড়াজড়ি করা শরীর দুটো লাইনের উপর পড়ে যায়। পূর্ণিমায় যেমন জোয়ার আসে, ভরা কোটালে সমুদ্রের তটে কাঁকড়া ওঠে, আর ভরা বর্ষায় ইলিশ ডিম পাড়তে মিষ্টি জলে আসে, সেই সময়েই ইলিশগুলোকে ধরে ফেলে লোভী মানুষেরা! একবারও ইলিশের কথা ভেবে কেউ কি মাছ না ধরার কথা ভাববে? সে তো তাহলে পাগল! ঠিক সেই রকমই স্টেশনে ট্রেন ঢোকে। প্ল্যাটফর্মে জন্ম হবার কারণে এদের চোখে দেখতেও হয় না। কানে শব্দ শুনেই বলে দিতে পারে কোন দিক থেকে ট্রেন আসছে। এদের কানে সেই শব্দ পৌঁছিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু দুজনে তখনো ইলিশের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ করেই যাচ্ছে। ছাড়বে না। একটা বাচ্চা বলে ওঠে- "ঋত্বিক দা, ডাউন ট্রেন আসছে।"

ডাউন ট্রেন। অর্থ পরিষ্কার এক্ষেত্রে। ডাউন ট্রেন এক নম্বর প্ল্যাটফর্মেই ঢোকে! মানে যে লাইনের উপর পড়ে দুইজনে দুইজনকে শেষ করে দেবার কথা ভাবছে, ট্রেন ঢুকছে সেই লাইনেই! শুনেও ছাড়ে না কেউ কাউকে! মরলে মরব। ভাবছে হয়ত দুইজনেই। কিংবা কে জানে ওই মুহূর্তে মানুষের চিন্তাশক্তি লোপ পায় কিনা!

ট্রেন ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকে। সব্বাই চিৎকার করে! কিন্তু যে দুজন বন্ধু এই মুহূর্তে শত্রুতায় পর্যবসিত, তারা কেউ কাউকে ছাড়ে না। অথচ সবার অলক্ষ্যে সেই মুহূর্তে সেই এক এবং একমাত্র ইলিশের টুকরোটা তার কাঁটা সমেত খাওয়া শেষ করে হাত চাটছে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ানো বিড়ালটা।

একটি গান এবং অনলাইনের বৃষ্টি

নির্জনতা কখনো কখনো সবচেয়ে বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কে জানে তানসেন কি এই সুরটা গলায় তুলেছিলেন কখনো? ময়ূর নেচেছিল? কিংবা বাতাস কি মেঘকে দূত করেছিল?

নির্জন ঘরে মনোময় যখন গেয়ে উঠলেন:

"আজ শ্রাবণের বাতাস বুকে, এ কোন্ সুরে গায়...

আজ বরষায় নামল সারা আকাশ আমার পায়..."

একদম আচমকা মেঘ ডেকে উঠল। যতখানি তীব্রতায় সে আকাশকে চমকে দিল, তার থেকে অনেক বেশি কেঁপে উঠল আমার বুকের ভিতরে! এই সেই বৃষ্টি...! অবশেষে সে এসেছে! আমি জানতাম সে আসবে। আসবেই! কিন্তু এভাবে যে অপেক্ষা করেছিলাম তা কখনোই ভাবিনি! খুব ইচ্ছে করছিল ছুঁয়ে দেখতে। এই নিকষ রাতের আঁধার সাক্ষী! আমার খুব ছুঁতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দিনের আলোয় পারতাম না! আঁধারের অস্পষ্টতাকে সাক্ষী রেখে নিজেকে স্পষ্ট করে তুল্লাম। ব্যালকনির দরজা খুলে দিলাম হাট করে! আর উফ...! কী বৃষ্টি..! অঝোর ধারায় বয়ে চলেছে!

কতকাল বাদে বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ যেন ছিদ্র হয়ে গেছে। অঝোর ধারায় ঝুপঝুপে বৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত গন্ধ। কাব্যে সাহিত্যে বলে "সোঁদা" গন্ধ। কিন্তু আমার যেন মনে হয় এই গন্ধে খিদে পায়। তেষ্টা পায়। উস্কানিমূলক গন্ধ! কী কী যে পায় না এই গন্ধে তা লিখে বোঝাবার মতো ভাষা নেই কোনো অভিধানে। বৃষ্টির শব্দ আছে, ছিল। জানতাম। কিন্তু এই বৃষ্টির জ্বলন্ত দুটো চোখ আছে। সে আমাকে ইশারা করল। তাকে জড়িয়ে ধরতে বলল। ইসস! অত খাতির খায় না! এবার সে হাসল! বৃষ্টির ফোঁটার গায়ে যে এত সুন্দর ঝকঝকে দুই পাটি

দাঁত আছে তা কে জানত! বল্লাম- “খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু!”

সে খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাসির প্রতিটি শব্দে যেন নূপুর পায়ে রাধা নেচে উঠল। চোখে সংশয়ের ঘোর লাগা সন্দেহ নিয়ে বলি- “কে তুমি?”

বাধ্য হয়ে বলি- “আমি অতি সাধারণ! দূর্বা ঘাসের মতো। প্রতিবাদ নেই। কিন্তু চিরকালীন কামনা আছে!”

বৃষ্টির একটা নতুন ফোঁটা একদম দামাল ছেলের মতো ছুট্টে এসে গাল ছুঁয়ে দিয়েই হেসে উঠল। পুরুষ এবং নারী স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদা শরীরের অধিকারী হলেও ভালোবাসার রকমফেরে নারীত্ব এবং পুরুষত্ব খর্বও হয়। কখন যে কার হাতে উঠে আসবে নির্দিষ্ট চিহ্ন, তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। অথচ এরা দুজন মিলেই অর্ধনারীশ্বর। আমি সব বুঝি। বৃষ্টিও বোঝে। বুঝে বুঝেই বাতাসও বয়ে চলে। রাতেরও নিজস্ব ভাষা আছে। এই মুহূর্তে সে চুপ করে আছে। চোখ চেয়ে দেখছে অবশ্য সব। মানুষ কখনো কখনো রাতের সন্তান হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে আমি ঠিক তেমন করেই ভয় পাচ্ছি গভীর বৃষ্টিঝরা রাতকে। বৃষ্টি যেন অন্য কোনো আপেক্ষিক শূন্যতাকে ভরে রাখে যে স্বপ্ন, তারই প্রতিরূপক।

অথচ প্রথম প্রেমে পড়া চাতকের মতো পিপাসার্ত। চোখ কেমন করে এত মদির হয়? মানুষের সন্তানের চোখে মদিরতা থাকলে খুব স্বাভাবিভাবে না হলেও নারী উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু অন্ধকার রাতের সীমানা সর্বগ্রাসী। খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই রাত। এই ভাসানো প্রক্রিয়ার মারাত্মক ক্ষমতা কখন যেন আমাকে আমার থেকে কেড়ে নিল। তারপর অতি যত্নে পরিয়ে দিল বৈকল্যের প্রমত্ততা! ঠিক সেই সময় মোবাইল বেজে উঠল। আমি ততক্ষণে হারিয়ে ফেলেছি আমাকে। শুধু ইট চাপা দূর্বাঘাসের মতো ফ্যাকাসে গলায় বলি- “হ্যালো।” ফোনের অন্য প্রান্তে বৃষ্টি নেই। রাত নেই। স্বাভাবিক গলায় সে বলল- “মনে হচ্ছে আমার থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছো...!”

বল্লাম- “আমারো তাই মনে হচ্ছে!”

বৃষ্টিহীন খটখটে গলায় সে বলল- “আসলে প্রকৃত আর বিকৃত শব্দদুটোর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র প্রথম অক্ষরদুটোই আলাদা। বাকি সব একই!”

অনেক, বহুবছর আগে লেখা একটা কবিতা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

“গললে তো গলেই যেতাম
ঠিক তখুনি আগুনে।
যখন ছিলাম ভীষণ একা
কোকিল ডাকা ফাগুনে!
আজকে আমার ধূসর আকাশ
মুছল সকল শর্ত
মেঘের মতো আড়াল মুছে
আজ তোমাতেই মত্ত!”

গলায় মধু ঢেলে বলি- “সাধারণ মানুষের স্বভাবই হলো এভাবে নিজেকে এবং নিজের সবথেকে কাছের মানুষকে ধোঁকা দেওয়া।”

অনলাইনের অপর প্রান্তের পুরুষটি বলে- “যুক্তি দিয়ে বোঝাও!”

এবার আমার হাসি পেল- “যেখানে আসলেই মিথ্যের বসবাস, সেখানেই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।”

অনলাইন এরপরও বলে- “আসলে ছুটির দিনের অলসতাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভরিয়ে দেবার লোভ সামলাতে না পারার ফল। আর কিছুই না!”

আবার হাসি পেল।

"যুক্তি দিয়ে নিজেকে আর কত হেয় প্রতিপন্ন করবে!”

সে বলে- “বড়ো হেঁয়ালি করে কথা বলছো আজ!”

বল্লাম- “সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবার আগে কেউ কি ফিরতে পারে?”

একটা তুমুল মনোবেদনা চেপে রেখে হাসির মতো হেসে দিয়ে সে বলল- “ফিরতে চাইলে যে কোনো জায়গা থেকেই ফেরা যায়!”

রাত্রির গায়ে আমার শরীরের ছোঁয়া লাগতেই ধ্বক করে কেঁপে উঠল বুক। সত্যি কথা বলে ফেল্লাম- “নাহ! ফেরা যাবে না। আমাকে ভুল বুঝেছিলে। আমি বৃষ্টিতে ভিজছি। আমি রাতের বুকে মুখ রেখে শুয়ে আছি। আর রাত আমার মাথায় চুমু খাচ্ছে...! বৃষ্টি আমার সারা শরীরে আদরের নিষ্পাপ আর অবিশ্বাস্য বিপুলতাকে মেলে দিয়েছে...!”

নৃশংসতাকে কিছুমাত্র সৌজন্যপূর্ণ করে তোলার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করে

সে বলল- “থাকে মরুভূমিতে। সে নাকি শুধু বৃষ্টিতে ভিজছেই না। বৃষ্টি নাকি আবার ভালোওবাসছে...! হা হা হা...!”

একটি মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে অতি সূক্ষ্মভাবে তাকে চিনতে হয়। সামান্য গানের একটা কলি দিয়েও ছোঁয়া যায় হৃদয়। আবার বেশি চিনে গেলে কেউ কেউ ভালোবাসার মানুষকে অনায়াশে এত ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নেয়, যে যেকোনো সময়েই সম্পূর্ণ আত্মাটাকেই উপড়ে আনা যায়! আমি তো জানি যে আমি মরুভূমিতে থাকি। জানি এখানে বৃষ্টি নেই! তাহলে এতক্ষণ কে ডাকল আমাকে? খুব দেখতে ইচ্ছে করল বৃষ্টিকে! এতক্ষণ যে সুখ দিয়েছে, স্বপ্ন দেখিয়েছে, একবার তাকে দেখতে চাই!

এই গভীর রাতে ব্যালকনির দরজা খুলতেই ছাপ্পান্ন ডিগ্রির গরমের এক হল্কায় যেন পুড়ে গেলাম! কোথাও এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই! কী উন্মত্ত তাপের প্রচণ্ড প্রকাশ!

কঠিন বাস্তব যেন অট্টহাসি দিয়ে উঠল। অথচ আমি এতক্ষণ বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটার সাথে খেলছিলাম। কথা বলছিলাম। হাসছিলাম এবং ভাসছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম। আমি এখনো চুপচুপে ভিজে। সারা শরীর ভিজে কাক। অথচ এসির মধ্যে প্রতিদিনই কম্বল গায়ে দিয়ে শুই। আজও তেমনই শুয়েছিলাম। জবাব দিতে চাইলাম অনলাইনের বন্ধুকে। দেখি সে হাওয়া। এদিকে অফ লাইনের গভীর রাত আমারই পড়ার টেবিলে থুতনিতে হাত রেখে, টেবিলে কনুইয়ের ঠেস দিয়ে আমাকেই দেখে যাচ্ছে নির্নিমেষে!

মনোময় তখনো মধু ঢেলে যাচ্ছেন নির্জনতায়-

"আজ শুধু মেঘ সাজাই মেঘে
আজ শুধু মেঘ বুকে
আজ শুধু বিষ ঢালবে আকাশ
বিষ মেশানোর সুখে...!”

সুখটান

একদিন এক সুন্দর সকালে চোখ মেলেই নিখিলেশ বুঝতে পারলেন তাঁর কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বার হচ্ছে না। তিনি অনেক চেষ্টা করে দেখলেন। শব্দ বার না হওয়া এক জিনিস তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর বাকযন্ত্রে কোনো শব্দ উৎপন্নই হচ্ছে না। মহা ঝামেলায় জর্জরিত হয়ে অবশেষে নিখিলেশ ডাক্তারের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর বিছানা ছাড়লেন এবং টয়লেটে গিয়েই একটা সিগারেটের মুখে আগুন জ্বালালেন। আগুন জ্বলে উঠতেই তাঁর ধোঁয়া পানের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠল। ভোরে জেগেই কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বার না হতে তাঁর যে ভীষণ অশান্তি আর দুশ্চিন্তা ছেয়ে গেছিল, সমস্ত চেতনা জুড়ে, তার উপশম হলো।

ধবধবে সাদা, লম্বা বস্তুটার আগায় আগুনটা ধরাতেই শান্তিতে হৃদয় ভরে উঠল তাঁর। দুই ঠোঁটের মাঝখানে তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে ধরে তিনি শুষে নিতে লাগলেন ধোঁয়া। বুকের ভিতরে যেখানে যেখানে যন্ত্রণারা ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে, তাদের ভরিয়ে দিলেন সুখে আর স্বস্তিতে! আহ! কী যে সুখ, এই সুখটানে! বুকের মধ্যে ফুরফুর করে সুখের বান ডেকে গেল। এইটুক একটা সিগারেট! এর কী বিশাল ক্ষমতা! নিখিলেশের চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে শান্ত এক দিঘি। কোনো জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই! আহ! কী আরাম! নিখিলেশ কথা বলার চেষ্টা করলেন আবার! এবার পুরুষ হাঁসের মতো ফ্যাস ফ্যাসে এক আওয়াজ বার হলো তাঁর মুখ দিয়ে। তিনি তারমানে বুঝতে পারলেন যে তাঁর বাগযন্ত্র ঠিক আছে। উৎপন্ন হচ্ছে শব্দ কিন্তু বাইরে আসছে না। তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার যে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন, তা কিন্তু তাঁর জানা ছিল না।

ডাক্তার বললেন, কখনো কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়েছে কী না, ঢোক গিলতে

অসুবিধা হয় কী না। গলার ভিতরে দেখলেন, বাইরেও দেখলেন। গলার বাইরে দুই-এক জায়গায় ছোটো ছোটো গুটলি মতোন দেখে জানতে চাইলেন যে ওগুলো কতদিন ধরে হয়ে আছে। বা তিনি কতকাল ধরে সিগারেট খাচ্ছেন। নিখিলেশের মনে পড়ল নিতান্ত বালক বয়সে, বাবার পকেট থেকেই প্রথম বিড়িটা তিনি ধরিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গলার ওই গুটলি কবে হয়েছে, তা তিনি মনেও করতে পারলেন না। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে গলায় একটা অস্বস্তি হতো বটে। মনে হতো ভিতরে কিছু একটা কঠিন পদার্থ রয়েছে যার কারণে ঢোক গিলতে পারছেন না তিনি।

আজ সকালে বিপাশাকেও তিনি কিচ্ছু জানাননি। ছেলের স্কুল নিয়ে ও খুব চাপেই থাকে রোজ সকালে। এখন ডাক্তারের কথা শুনে নিখিলেশের তো বেশ ভয় ভয়ই লাগছে। দুপুর হতে চলল এখনো গলার স্বর ঠিক হলো না। এখনো সেই পুরুষ হাঁসের মতো ফ্যাস ফ্যাস করে কথা বলছেন তিনি। দুই তিনবার বিপাশা ফোন করেছেন। মেসেঞ্জার চ্যাটে কথা বলেছেন। ফোন ধরেননি তিনি। ওইভাবে কথা বললে ওরা চিন্তা করবে খুব। অবশেষে ডাক্তার গলা থেকে লিক্যুইড নিলেন। বায়াপ্সি করতে পাঠাবেন। বায়াপ্সি শুনেই রাজ্যের ভয় এসে দানা বাঁধল মনে। সর্বনাশ! তাঁর কিছু হলে ওরা দুইজন যে পথে বসে যাবে! ডাক্তারকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি- “কী হয়েছে আমার?”

ডাক্তার বল্লেন- “বায়াপ্সি রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে! অন্য কোনো পথ নেই!”

ডক্টর আরো বল্লেন- “আপনার সবে ত্রিশ বছর বয়স! কে কে আছে সংসারে?”

নিখিলেশ বললেন- “ছেলে আর বউ।”

বউটা যে আবার অন্তঃসত্ত্বা তা আর মুখ দিয়ে তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না । ডাক্তার আরো বললেন “সিগারেট একদম ছোঁয়াও যাবে না! একটাও নয়। এমন কি যাঁরা সিগারেট খান, তাঁদের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না!”

নিখিলেশ এই কথাটা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি তো সারাজীবনই তাঁর স্ত্রী এবং ছেলের সামনেই সিগারেট খেয়েছেন! তাহলে প্যাসিভ স্মোকারের সমস্ত ক্ষতি ওদেরও হয়েছে!

নিখিলেশ চরম যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। বাড়ি ফিরছেন আর সিগারেট খাচ্ছেন। মনে মনে ভাবছেন, এ জীবনে আর তো খাওয়া হবে না সিগারেট! এই শেষ। সারাটা পথ তিনি সিগারেট ধরালেন, একটা থেকে আর একটা।

বাড়িতে ঢুকতেই বিপাশা কলকল করে উঠলেন- “কোথায় গেছিলে তুমি কাউকে কিছু না জানিয়ে?”

নিখিলেশ দেখলেন বিপাশাও ফ্যাসফ্যাস করে কথা বলছেন। নিখিলেশ কিছু বলার আগেই বিপাশা বলেন- “আমার সকাল থেকে ভীষণ গলায় ব্যথা করছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কতবার তোমাকে ফোন করেছি...!”

নিখিলেশ তখন সমস্ত বৃত্তান্ত শোনালেন। বিপাশা হতাশ হয়ে বল্লেন- “তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। তুমি সিগারেট খেয়ে যেটুকু এস্ট্রেতে গুঁজে দিতে, আমি পরে ওইগুলো খেতাম।”

নিখিলেশ অবাক। “মানে? ওগুলো কেমন করে খেতে?”

বিপাশা বলেন- “যেমন করে তুমি খেতে, তেমন করে। আগুন জেলে তারপর টেনে টেনে ধোঁয়া গিলতাম!”

নিখিলেশ বলেন- “আমরা খুব ভুল করেছি। তোমাকেও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বায়াপ্সি করাতে হবে তোমাকেও!”

বিপাশা বলেন- “এবং আর জীবনেও সিগারেট খাওয়া যাবে না!”

নিখিলেশ বলেন- “ঠিক।”

বিপাশা বলেন- “একটা অনুরোধ করব?”

নিখিলেশ জিজ্ঞাসু মুখে চাইতেই বিপাসা বলেন- “কোনোদিন একটা আস্ত সিগারেট খাইনি। আর তো জীবনেও খাওয়া হবে না। আজ একটা আস্ত সিগারেট খেতে দেবে প্লিজ!”

নিখিলেশের মনে হলো অনুরোধটা বিপাশা তাঁকে করেননি। তিনিই করেছেন বিপাশাকে। অতএব নতুন করে শেষ সিগারেটটা দুজনের ঠোঁটে জ্বলে উঠল। মৌজ করে দুজনেই যখন সুখটান দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই সুরজ বলে উঠল- “আহ! আজ দুজনেই খাচ্ছো! আজ তো তাহলে অনেক ধোঁয়া! আমি ধোঁয়া খাব!” বলে স্কুল ইউনিফর্ম পরা সুরজ ঘরের সমস্ত বিষ নিজের ফুসফুসে টেনে টেনে নিতে লাগল।

মা বল্লেন- “সুরজ বাবা, এই ধোঁয়া খুব বিষাক্ত! তোর বাবার আর আমার খুব বাজে অসুখ করেছে।”

বাবা বল্লেন-” হ্যাঁ, সুরজ। ঠিক!”

সুরজ বলে- "আমি তো জানি বাবা। আমি জানি মা, যে সিগারেট খেলে ক্যান্সার হয়! তবুও তোমরা খেতে বলে আমি ওই ধোঁয়া টেনে নিতাম। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধে দারুণ নেশা হয় বাবা! ভাবতাম আমার হিরো আর হিরোইনের মনে হয় অস্বাভাবিক কোনো ক্ষমতা আছে।"

তিনজনেই কিছুক্ষণ কাঁদেন। অবশেষে বিপাশা নিখিলেশকে-বলেন- "চলো ফেলে দিয়ে আসি সমস্ত সিগারেটের প্যাকেট!"

সুরজ বলে- "চলো। আমিও যাব তোমাদের সাথে!"

স্বামী-স্ত্রী এবং সুরজ সমস্ত সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে ফেলে এলেন রাস্তার ডাস্টবিনে। তারপর খুশি মনে ঘরে ফিরলেন। মনে মনে বেশ খুশি তাঁরা। নিজেরা মরলেও ছেলেকে বাঁচাতে পেরেছেন।

নিখিলেশ বল্লেন- "আমি আর তুমি মরে গেলেও সূর্য আর চন্দ্র সুস্থ থাকবে।" বলতে বলতে নিখিলেশ নিজেদের ঘরের দরজা খুললেন। আর অবাক হয়ে দেখলেন অন্য একজন তাঁরই মতো দেখতে তাঁরই সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছেন। অবিকল নিখিলেশ।

বিপাশা বল্লেন- "আরে আমাদের ঘরে কে ঢুকেছে? কার পারমিশান নিয়ে? ওকে জিজ্ঞাসা করো?"

নিখিলেশ বলেন- "দাঁড়াও না! ঘর তো আমাদের। আজ না হোক কাল এই ঘর ওকে ছাড়তেই হবে! আমি শুধু ওর সিগারেট খাওয়ার শেষের সুখটানটা দেখতে চাই! "ঠিক সেই সময় ভিতর থেকে বিপাশার মতো দেখতে অন্য এক বিপাশা এসে নিখিলেশের পাশে বসে বল্লেন- "কোনোদিন একটা আস্ত সিগারেট খাইনি! প্লিজ...!" দ্বিতীয় বিপাশা সিগারেট ধরালেন। ঠিক সেই সময় কলিং বেল বাজল। এবং নিখিলেশ, বিপাশা আর সূর্যর সামনে থেকে দ্বিতীয় সূর্য এসে ঘরে প্রবেশ করল। প্রথম নিখিলেশ-বিপাশা-সূর্য অবাক হয়ে অনন্ত কাল ধরে দাঁড়িয়ে নিজেদের সুখটান দেখে গেলেন। সুখটানের নেশা তাঁদের জন্ম জন্ম স্থবির করে রাখল। তবুও, তবুও তাঁরা এক জোড়া বোকা কবুতরের মতো স্বপ্ন দেখতে লাগলেন যে বিপাশার গর্ভস্থ সন্তান নিশ্চয়ই নেশা-মুক্ত হবে।

অশ্রুর রং

ঘটনাটা কবে শুরু হয়েছিল তা মাম ঠিক বুঝতে পারেনি। কারণ রঙটাই খালি বদলেছিল। জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুই ছিল না। জ্বালা যতক্ষণ না থাকে, ততক্ষণ আমরা কিছুই চোখ পেতে দেখি না। কান পেতে শুনি না। গা পেতে মাখি না।

খুব সামান্য একটা করকরে অনুভূতি হচ্ছিল বটে কিন্তু ততটা অস্বস্তিকর মনে হয়নি তার। সেদিন বাইরে যাবার সময় মাম কাজল পরছিল। চোখদুটো সম্পূর্ণ কাজল কালো করার আগেই তার বাঁ চোখে একটা খোঁচা লাগে। তখন মাম দেখল কাজল পেন্সিলটা ভোঁতা হয়ে গেছে। পেন্সিলটা কেটে আবার কাজল পরতে গিয়েই দেখে চোখের সাদা অংশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বেগুনি রঙের জলীয় গড়িয়ে পড়ছে। সে যতটুক অবাক হলো, ভয় পেলো ততোধিক।

সব কাজ ফেলে মাম ডাক্তারের কাছে ছুটল। ডাক্তার ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। নাহ! চোখের কোনো দোষ নেই। ডক্টর তবুও নার্ভের ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। মাম অবাক হয়ে ভাবছিল যে তার শরীরের অভ্যন্তরে নিশ্চিত কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। যতরকম পরীক্ষা আছে সব করলেন নিউরোলজিস্ট। সমস্ত কিছু ঠিক আছে। ডক্টর বললেন- "মাম, আমার মনে হয় আপনার কিছু ভুল হচ্ছে। চোখ থেকে কখনো বেগুনি দ্রবণ বার হতে পারে না!"

মাম কী বলবে ভেবে পেল না। সে তো নিজের চোখে দেখেছে। সে তার পরদিন থেকে স্বাভাবিক কাজ করতে আরম্ভ করল। কিন্তু বেগুনি রঙের কথা সে প্রায় যখন ভুলতে বলেছিল, ঠিক সেই সময় একদিন আবার একটা অঘটন তাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলল। সেদিন সকালে বাজার থেকে ফেরার সময় একদম আচমকা তার স্কুটির ধাক্কা লেগে একটা বিড়াল ছানা থেতলে যায়। একটু তাড়া তার ছিল, এ কথা ঠিক। কিন্তু ওই বিড়াল ছানাটাই তার স্কুটির সামনে এসেছিল। সে মোটেও ধাক্কা মারেনি। সে তো রাস্তা দিয়েই চালাচ্ছিল

তার স্কুটি। এভাবে সামনে এসে পড়লে সে কী করবে? অদ্ভুত তো! মাম মনে মনে ভাবছিল আর কাজ করছিল নিজের। শত কাজের মধ্যেও ওই নরম শরম বিড়াল ছানাটার মুখ উপর দিকে করে সরু সরু দাঁত বার করে মৃত্যুবরণটুক সে ভুলতে পারছিল না। দ্রুত রেডি হতে হতে মাম চোখে কাজল লাগাচ্ছিল আজও। আজও একটা খোঁচা লাগল তার চোখে। এবং সে কাজল পেন্সিলটা দেখল চোখের সামনে এনে এবং এবারও দেখল সেটার কাঠের কঠিন অংশটুক ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই এই খোঁচা! মাম কাটার দিয়ে পেন্সিলটা কাটছিল যখন, অদ্ভুতভাবে চোখ থেকে মোটা মোটা নীল রঙ ঝরতে দেখল। এবার মাম ভিডিও করে রাখল নীল রং ঝরে পড়ার। এবং ডাক্তারের কাছে গিয়ে এবার জোরের সাথে সে জানাল যে, তার চোখ থেকে নীল তরল পড়েছে।

ডক্টর আবার দুই ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করলেন। একই সিদ্ধান্ত নিলেন। নাহ। মামের চোখে কোনো সমস্যা নেই। আগের মতই আবার তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা করার উপদেশ দিলে মাম পরিষ্কার জানাল যে তার কাছে প্রমাণ আছে। সে ভিডিওটা ডাক্তারকে দেখাল। ডাক্তার বললেন- “এটা কী দেখাচ্ছেন? আপনার চোখ থেকে কিছুই ঝরছে না! আরে বাবা আগে তো অশ্রু ঝরছে দেখান। তারপর না হয় রঙের ব্যাপারটা ভাবা যাবে!”

মাম বলল- “এই তো রঙ ঝরছে! স্ট্রেঞ্জ! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?”

ডাক্তার বললেন- “না, আমি তেমন কিছুই দেখছি না!”

মাম এরপর থেকে ভাবতে আরম্ভ করল তার চোখে কী কিছু সমস্যা হয়েছে? সে অন্য চোখের ডাক্তারও দেখাল। কিন্তু ফল একই। তার চোখ একদম ঠিক আছে।

মামের শরীরে এখন প্রচন্ড পিপাসা, তার সমস্ত পরিকল্পনা যেন ভেসে যাচ্ছে বানের জলে। যেন তার নিজস্ব চেতনায় বৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড হু হু বাতাস! সে কখনো রেল লাইন ধরে হাঁটে আর তার চোখে ঢোকে ধুলো বালি। সে চোখ রগড়ায় আর তার হাতে উঠে আসে আকাশী রঙ। সে কখনো উদ্দেশ্যহীন হাসপাতালে বসে থাকে। কারো আত্মীয়ের মৃত্যু দেখে কাঁদতে চেষ্টা করে। তার হাতে উঠে আসে সবুজ তরল। সে ভাবে সে দৌড়ে যাবে ডক্টরের কাছে। কিন্তু যায় না। কেননা সে জানে নিরাময়তাকে সে কোনোদিন ছুঁতে পারবে না!

একদিন অন্যমনস্ক মাম ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল। সে দেখল একজন হাড় জিরজিরে ভিখারি টাইপ লোক মাথায় কিছু বহন করছে। সে হঠাৎ কিছু

ভেবে সেই লোকটালে ডাকল। সে ছিল রাস্তার উল্টোদিকে। ভিখিরিটা মামকে কী ভাবল তা মাম জানে না। কিন্তু তার যে ভিক্ষে করার অভ্যাস আছে তা বোঝা গেল। কারণ লোকটা দ্রুত রাস্তা পার হতে চাইল। মাম চিলতে হাসল। কেন তা সে নিজেও জানে না! লোকটা তড়িঘড়ি আসতে গিয়ে একটা সুন্দর প্রাইভেটের সঙ্গে ধাক্কা খেল। নাহ। মরেনি লোকটা। তার প্রাণটুক তখনো ছিল। কারণ ধাক্কায় সে নয়, তার মাথার বোঝা ফেটে গেছে। ঝরঝর করে ছড়িয়ে পড়ল চাল রাস্তায়। লোকটা কেঁদে ফেলল। বলল- "সারাডা মাসের আয় ছেলো মোর!"

ভিখারির মতো লোকটা উবু হয়ে রাস্তায় বসে, বিড়ালের মতো দাঁত বার করে কাঁদছিল। মাম সিগারেট টানতে টানতে স্মার্টলি সে স্থান ত্যাগ করল। সে ভাবল তার দৃষ্টি খারাপ? নাকি চোখটাই খারাপ, এটা না জেনে তার শান্তি নেই।

অনেকদিন পরে, অনেক দিন ধরে না খোলা ফ্রিজটা খুলে মাম কিছু রান্না করবে ভাবল। দেখল ফ্রিজের ভিতর একটা ইঁদুর আর অনেকগুলো আরশোলা মরে, চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। মাম খুব জোরে জোরে হাসল। হাসতে হাসতে বলল- "শালা ইঁদুর, আর শালার ব্যাটা শালা আরশোলা তোমরা আত্মহত্যা করার আর জায়গা পাওনি? কী ভেবেছো এখানে এসে মরলে আমি না খেয়ে থাকব? না খেতে খেতে মরেই যাব? কখনোই না!"

মাম এতসব বলল আর খুব খুব হাসল। সে হাসল তবু তার চোখ থেকে জলীয় দ্রবণই ঝরল। মাম তর্জনী দিয়ে সেই দ্রবণ তুলে আনল চোখের সামনে! কী অদ্ভুত! এ যে কমলা রঙ!

মাম এবার পাগল হয়ে যাবে। সে অনেক ডাক্তারই দেখিয়েছে কিন্তু কেউই তার অশ্রুকে রঙিন দেখেননি। বিছানায় চিৎপাত শুয়ে থাকল কিছুদিন মাম। ফ্রিজে মাছ, ডিম ছিল। রান্না করল। খেল। তারপর একটা আয়না ধরল চোখের সামনে। চিৎ হয়ে শুয়ে সে চোখের সামনে আয়না ধরে দেখতে লাগল। সময় তার নিজের গতিতেই চলছে। মামের সময় থেমে গেছে। তার আর কোনো কিছু পৃথিবী থেকে পাবার বা পৃথিবীকে দেবার যেন নেই।

হঠাৎ মাম চিৎকার করে নিজের কাছেই জানতে চাইল। "কেন? কেন? কেন?"

মা ছাড়া তার কেউ নেই। সে চাকরিটা পেয়েই শহরে চলে এসেছে। মা রয়ে

গেছে গ্রামের সেই মাটির বাড়িতে। আজ পর্যন্ত মা তার কাছে আসেনি! সেও যায়নি। আজ মাকে মনে পড়ছে খুব। ভীষণভাবে আজ তার মাকে মনে পড়ছে! সেই কুলতলা, সেই মাঠ, পুকুরঘাট, সেই জিরেনতলা, সেই হু হু বাতাস বয়ে চলা...! কতকাল সে যেন জল খায় না! এতটাই তার পিপাসা! ভাবতে ভাবতে মাম ঘুমিয়ে পড়েছে যেন কখন! ঘুম ভেঙেই সে দেখে, তার দুই চোখ ভেসে গেছে। সে বুঝতেই পারেনি যে দেশের জন্য তার টান এতটাই রয়েছে ভিতরে ভিতরে! চোখ দুটো মুছতে গিয়েই সে টের পেল অশ্রুটা কেমন যেন আঠা আঠা! এবং সেই মুহূর্তেই খেয়াল হলো, তাই তো রঙটা কেমন তা তো দেখতেই হবে! সে আয়না চোখের সামনে ধরতেই দেখল রক্তের মতো লাল রঙে ভেসে যাচ্ছে তার চোখ এবং দুই গাল! সেই টকটকে লাল রঙ তার গলা বেয়ে বুকের জামাও রঙিন করে তুলেছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে সে নিজেই ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্কে দিশেহারা মাম ওই মুহূর্তে অনেকটা সময় কাঁদল। যতই সে কাঁদছে, ততই লাল জলীয় দ্রবণে ভেসে যাচ্ছে তার ইহকাল, তার পরকাল। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল মাম। সে তার চোখ দুটো দান করবে!

অনেক হয়েছে। এই চিন্তাটা আসার সাথে সাথে মনে মনে অনেক স্বস্তি পেল সে। হ্যাঁ, যে চোখ কাজে লাগছে না, বরং অকাজের, সেই চোখ না থাকলেই তার সব ফিরে আসবে। নাহয় নাই বা ফিরে এল, তবু তো এইরকম অসহায়ের মতো সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ করে দিয়ে পাগলের মতো আচরণ করতে হবে না! সে এইসব ভাবছিল আর উপরের ফ্যান দেখছিল। ভাবছিল আর উঠবেও না। খাবেও না। মরে গেলেই বা কী? ভেবে সে চিৎপাত শুয়ে শুয়ে উপরের ফ্যান দেখছিল! ফ্যানটা ঘুরছে না। ঘুরবে কেমন করে? সে তো সুইচ অনই করেনি। নাহ। সে অন করবে না সুইচ! যা হবার হোক। দেখা যাক। হঠাৎ তার আবার এই চিন্তাটাই মনে এল। সমস্ত কিছু নষ্টের মূল তার চোখ দুটো। সে চোখের উপর হাত বোলাতে লাগল। এই চোখ দুটোর জন্যই তার পাগল পাগল দশা! বেঁচে থাকতে গেলে এ দুটোর প্রয়োজন নেই। এ দুটোকে তাকে শেষ করতেই হবে। ত্যাগ করতেই হবে চোখের মায়া! কিন্তু কেমন করে? মাথাটা দপদপ করছে। বাইরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। মাম হাসপাতালে ফোন করল। সে জীবিত অবস্থায় তার চোখ দান করতে চায়।

একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ঠিকানা দিয়ে হাসপাতাল সাহায্য করল। মাম রাতের অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ল। এই চোখ রাখার থেকে অন্ধ হওয়া শতগুণে ভালো। মাম যখন ওই সংস্থায় ফোন করল, তাঁরা বললেন যে, সেই

মুহূর্তেই তাঁদের দুটো চোখ চাই। বেশ ভালো অর্থই তাঁরা দেবেন। মাম রুগির লোকজনের থেকেও দ্রুততায় হাসপাতালে পৌঁছাল এবং তাকে সাদরে গ্রহণ করা হলে হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল আবার! কতদিন মাকে দেখে না সে! চোখ চলে গেলে এ জীবনে আর কখনো তার মাকে তো দেখা হবে না! ভাবতে ভাবতেই নার্স এসে বললেন, যে তাঁর সময় হয়েছে। এবার তাঁকে অপারেশান টেবিলে নিয়ে যাওয়া হবে! । অপারেশান টেবিলে যাবার সময় সে মায়ের সাথে ভিডিও কলে কথা বলতে চাইল। কথা বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। মাকে আর সে দেখতে পাবে না! তাকে কাঁদতে দেখে মা বলেন- “কাঁদিস কেন? শরীর খারাপ?”

চমকে উঠল মাম। সে কাঁদছে! কেমন রঙের জল বার হচ্ছে? সে তর্জনীর আগায় দুফোঁটা অশ্রু তুলে আনল। তারপর চোখের সামনে ধরেই চিৎকার করে উঠল!

"মা, মাগো, মা আমার...!”

তার হাতের আগায় এক ফোঁটা অশ্রু টলটল করছে! একদম সব্বার মতো! এতদিনে অশ্রু তার নিজস্ব রঙ খুঁজে পেয়েছে!

ফোনটা ভিডিও কলে রেখেই মাম বলল- “মা, মাগো তুমি যেও না! আমাকে ছেড়ে যেও না মা!”

শীলা জলে ভাসে

ডিজিটাল দুনিয়ায় একটা নতুন অ্যাপ এসেছে। তার নাম আলাদীন। হয়ত আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের থেকেই এই নামকরণ। আলাদীন অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাজ করছে। কখনো সমানুপাতিক হারে। কখনো ব্যস্তানুপাতিক হারে। কখন যে সে কীভাবে কাজ করবে তা দেবতারাও জানতে পারেন না। অনেকেই অনেক উপকৃত হয়েছে এই অ্যাপের সাহায্যে। ব্যক্তিগত জীবনের যাপিত বৈশিষ্ট্য ছাড়া মন এবং ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুসারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে এই অ্যাপ। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেই লক্ষ-কোটি ইচ্ছা বা খুশি ফটাফট ফটাফট টাইপ হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়বে ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত ওয়ালে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির নিজস্ব বাস্তবতা থেকে একটা পারফেক্ট উদাহরণ দিতেও এক সেকেন্ড সময়ও নেবে না এই অ্যাপ।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সি সংসারী শীলা নিয়েছে অ্যাপটা।

এই বয়সে এসে তার হঠাৎ মনে হলো যে তার অনেক শত্রু আছে। তো সে আলাদীনের কাছে তার শত্রু সংখ্যা কমিয়ে দেবার বর প্রার্থনা করল। ওর ধারণা ছিল এরকমই যে, তার তো শ্বশুর বাড়ির তরফে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এবং এমন কী বাপের বাড়ির দিকেও শত্রুতার সংখ্যা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। তাদের চিহ্নিত করবে এই আলাদীন। তাই ভেবে সে টাইপ করে এরকম লিখল- “আলাদীন আপনি আমার শত্রুদের সংখ্যা কমিয়ে দিন!” বাক্য শেষ হবার সাথে সাথে ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফটফট হুড়মুড় করে শতকরা কতটুকু কাজ হচ্ছে তার লিখিত চিহ্ন দেখানো আরম্ভ হলো এবং এত্ত দ্রুত সেই পদ্ধতি এগুচ্ছে যা অভাবনীয়। শীলা সেইদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর হাসিতে ওর মুখ ভরে যায়। ওর খুশির কারণ এইটাই যে, এখুনি ও ওর শত্রুদের নাম-ধাম ইত্যাদি জেনে যাবে। মানুষ চেনার মতো খুশি দুনিয়ায় আর দুটো নেই!

ডাটা প্রসেসিং শতভাগ সম্পূর্ণ হলেই ও বুঝতে পারবে কে ওর বন্ধু এবং কে ওর শত্রু । ভাবনা সম্পূর্ণ হবার আগেই মেসেঞ্জারে ওর বর্তমান অনলাইনের প্রেমিকের মেসেজ ঢুকল- “কী গো, আনফলো করেছো নাকি আমাকে?”

শীলা বলে “না তো! আনফলো করব কেন?”

একদম নতুন মানে দিন সাতেকের প্রেমিকটি বলে- “তুমি আমাকে আনফলো করেছো! আমি তোমায় নতুন করে সার্চ করে খুঁজে তবে মেসেঞ্জারে এসেছি। ... হ্যাঁ, এইমাত্র দেখলাম আমরা আর বন্ধু তালিকায় নেই।”

শীলা নিজেও ততক্ষণে প্রোফাইলে গিয়ে দেখে এসেছে ওর এই নতুন প্রেমিক সত্যিই আর ওর বন্ধুতালিকায় নেই। ও বলল- “জানি না, কী করে কী হলো, তবে আমি এখুনি আবার তোমায় রিকু পাঠাচ্ছি।”

শীলা রিকু পাঠাতে অক্ষম হলো। তার সাত দিনের প্রেমিক বলল- “আমিও তোমায় রিকু পাঠাতে পারছি না। পাঠালেই অটোমেটিক রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে!”

ঠিক এই সময় শীলার দশ দিন আগের প্রেমিকও একই অভিযোগ নিয়ে এল। তারপর এক মাস আগে অনলাইনের প্রেমিক এল। মোটামুটি সকলেরই একই অভিযোগ।

শীলা অবাক হয়ে দেখল যে ফেসবুকে তার চার হাজারের উপর বন্ধুরা কেউই আর তার ফ্রেন্ডলিস্টে নেই। সবাই রিজেক্টেড। সে কাউকেই রিজেক্ট বা ব্লক বা আনফ্রেন্ড করেনি। তাহলে ঘটনাটা কী? সবচেয়ে মজার কথা হলো এটাই যে, রিজেক্ট হওয়া বন্ধুদের পুনরায় ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানোও যাচ্ছে না। সে এবং তার বন্ধুরা সকলেই যখন কারণ খুঁজছে ঠিক সেই সময় একটা ফোন এল তার মোবাইলে। সে নম্বর দেখে বুঝতে পারল এই ফোন করেছে তার সাত দিনের প্রেমিকটি। শীলা ফোনটা ধরল এবং হ্যালো বলল। কানেক্ট হচ্ছে কিন্তু অদ্ভুতভাবে কেউ কারোর কথা শুনতে পাচ্ছে না। দ্বিতীয় জনের ফোন এল। শীলা কারো সাথেই কথা বলতে পারল না। বস্তুত সে নিজের কথাই খালি শুনতে পাচ্ছে। যত বেশি ফোন আসছে তত বেশি তার নিজের কথা নিজের কানেই ধাক্কা মারছে। এবং ধীরে ধীরে নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই ফিরে আসছে আরো অনেক অনেক জোরে। কান এত উচ্চ শব্দ শুনতে পারছে না। শোনার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার মনে হচ্ছে কানের পর্দা এবারে ফেটে যাবে। সে তাই ধীরে ধীরে আস্তে কথা বলতে আরম্ভ করল। একটা সময় সে প্রায় ফিশফিশ করে কথা বলতে লাগল। কিন্তু তাতেও

কানে কষ্ট হতেই থাকল। ঠিক সেই সময় অটোমেটিক কিছু টাইপ হতে থাকে ল্যাপটপের স্ক্রিনে।

শীলা অবাক হয়। কারণ সে কিছু টাইপ করছে না অথচ টাইপ হয়ে যাচ্ছে। লেখা ফুটে উঠল- "আমি আলাদীন বলছি। আপনার চার হাজার বন্ধুর মধ্যে কেউই আপনার বন্ধু তো নয়ই। তারা ভিতরে ভিতরে আপনার শত্রু। চাইলে কে কী কারণে আপনার সাথে বন্ধুত্ব করেছে, কার কী ভবিষ্যৎ প্ল্যান, সবই বলতে পারি।"

শীলা চরম অবাক হয়ে গেল! এতগুলো মানুষ তার শত্রু? অথচ এরাই তার প্রোফাইলে পড়ে আছে বন্ধুত্বের মুখোশে? ভাবছে সে মনে মনে। যাক। আলাদীনের কল্যাণে আগে ভাগেই জানতে পেরেছে। এইটাই তার সান্ত্বনা। সে এবার বলল- "আমার বন্ধু সংখ্যা বাড়িয়ে দিন আলাদীন!"

আলাদীন লিখল- "আপনার বন্ধু বা শত্রু সংখ্যা বাড়াবার বা কমাবার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু বন্ধু নয়, অথচ বন্ধুর ভান করে আছে সেই তাদেরই চিহ্নিত করতে পারি। শত্রুদেরও পারি।"

শীলা লিখল- "তাহলে আপনি কী বলতে চান আমার বন্ধুর সংখ্যা কী একেবারেই নেই?"

আলাদীন লিখল- "না। আপনারা এখন অনলাইন বন্ধুদের নিয়ে চলেন। অনলাইনে বন্ধু পাওয়া যায় না। বন্ধু ভেবে যাঁদের আপনি গ্রহণ করেছেন তারা প্রত্যেকে সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।"

শীলা বলল- "কিন্তু কেন? আমি তো তাদের কারো কোনো ক্ষতি করিনি।"

আলাদীন লিখল- "ক্ষতি করেননি। কিন্তু ভালোবাসার কথা লিখেছেন।"

শীলা বলল- "ভালোবাসার কথা লেখা অপরাধ?"

আলাদীন বলল- "ভালোবাসার কথা লেখা অপরাধ কিনা জানতে চাইছেন? আচ্ছা, আপনি বলুন তো একসঙ্গে কত মানুষকে আপনারা ভালোবাসতে পারেন?"

শীলা কথা বলতে গিয়েও থেমে যায়। আসলে যে কয়জনের সাথে সে ভালোবাসার কথা বলে, তাদের প্রত্যেকের সাথেই কোনো না কোনো স্বার্থ চরিতার্থ হবে বলেই সে কথা বলে। এ কথা ঠিক। কখনো কারো সাথে একাকিত্ব কাটাবার জন্যও কথা বলে। অথচ সব্বাইকেই সে ভালোবাসার কথা

বলে। শীলা কিছুক্ষণ কিছু ভেবে নিয়ে বলে- “কিন্তু ক্ষতি তো কারোর করি না। বলেছি তো ভালোবাসারই কথা!”

আলাদীন বলে- “ভালো না বেসে ভালোবাসার কথা বলার মতো মারাত্মক অপরাধ আর একটা নেই দুনিয়ায়। আর তাছাড়া পুরুষ মানুষ মুখে ভালোবাসা শুনলে শরীরে তাদের চাহিদার উদ্ভব হয়। এবার আপনি বলতেই পারেন যে, আপনি যদি সবার সব রকম চাহিদা মেটান তাহলে তারা শত্রু হবে কেন? এক্ষেত্রেও সবাই শত্রুই হবে। ভালো না বেসে শারীরিক মিলনে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়। তার প্রভাবে সবসময় ঘৃণাই উৎপন্ন হয়।”

শীলার নিজেকে খুব অসহায় লাগছে!

আলাদীন বলে- “আপনি একা নন। আপনাকে যাঁরা যাঁরা ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা করেছেন সব্বাইই এরকম কয়েক হাজার জনের সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে চলেছেন। এই যেমন ধরুন, আপনি তো আজ সকালেই যাকে বিবাহ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনার স্বামীকে ডিভোর্স দেবেন বলেও ভেবেছেন, যার জন্য সেই অলকেশ আজ আপনার সাথে এত কিছু করার পরও স্মিতা বলে একজনের সাথে ফোন সেক্স করেছে। ঠিক আপনার সাথে কথা বলার পরই।”

শীলা চিৎকার করে উঠল- “মিথ্যে কথা! হতেই পারে না! আমি ওকে খুন করব!”

আলাদীন হাসির ইমো দিয়ে বলল- “কেন? সেতো ভালোবেসেছে। আপনাকেও! স্মিতাকেও! আপনি কেন খুন করতে যাবেন? উনি তো আপনাকে খুন করার কথা বলেননি!”

শীলার চোখ ছলছল করে উঠল। যেন শীতকালীন কুয়াশা মাখা পুকুর। রোদ না উঠলে এই বাষ্প চোখের গভীরেই নিজেকে বন্দি করে রাখবে।

অনেকটা সময় লাগল শীলার নিজেকে সামলাতে।

তারপর ধীরে ধীরে লিখল- “পৃথিবীর কেউ আমাকে ভালোবাসে না? আলাদীন?”

আলাদীন লিখল- “আপনি কি কাউকে ভালোবেসেছেন? নিঃস্বার্থভাবে?”

শীলার চোখ দুটো ধীরে ধীরে বাষ্প-পরিপূর্ণ হতে লাগল।

বলল- “আমি সেভাবে কাউকে ভালোবেসেছি কী না জানি না...!”

আলাদীন লিখল- “বাহ! নিজে কাউকে ভালোবাসেননি অথচ অন্য কেউ আপনাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালো না বাসার কথা শুনে খুনি হতে চাইছেন?”

শীলা নীরবে ভাসতে থাকে।

আলাদীন লেখে- “শীলা জলে ভাসে...! দেখেছেন কখনো?”

তারপর নিজেই বলল- “আপাতত দুনজনকে পেয়েছি। এই দুইজনই আপনাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসেন!”

শীলার ধড়ে যেন প্রাণ এল! যাক! আছে আছে। অন্তত দুইজন আছে। ও তাতেই সন্তুষ্ট!

লিখল- “আলাদীন সেই দুইজনের প্রোফাইল লিংক দিন দয়া করে।”

আলাদীন এক মুহূর্তের মধ্যে দুইটি ফেসবুক প্রোফাইল লিংক সেন্ড করল শীলার মেসেঞ্জারে।

শীলা প্রথম প্রোফাইলে গিয়েই বলল- “সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়! আমার বাবা তো! আপনি কি আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন? আমার বাবা কি কথা বলবেন, আমার সাথে?”

আলাদীন লিখল- “বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এই পুনর্জীবন হলো ডিজিটাল। অর্থাৎ অনলাইনে উনি আপনার সাথে কথা বলবেন চ্যাট করে। ভিডিও কলেও কথা বলবেন।”

শীলা বলে- “ভিডিও কলেও কথা বলবেন? আমার বাবা কি সত্যিই বেঁচে ফিরেছেন?”

আলাদীন লিখল- “একবার তো বললাম যে, হ্যাঁ। আপনার বাবাকে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন!”

উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে যাচ্ছে শীলার! চোখে জমছে বাষ্প!

হঠাৎ সে বলে উঠল- “আচ্ছা আলাদীন, আর একজন কে যিনি আমায় সত্যি ভালোবাসেন?”

আলাদীন লিখল- “লিংকে গিয়ে একাউন্ট খুলুন!”

শীলা দ্বিতীয় লিংকে গিয়ে খুলে ফেলল। আর আনন্দে কী করবে সে বুঝতে পারল না।

এই লিংকে যাঁর নাম দেখা যাচ্ছে তিনি স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়। শীলার মা!

শীলা দ্রুত মেসেঞ্জার খুলল- “মা, তুমি কেমন আছো!”

মায়ের মেসেঞ্জার লিখল- “ভালো আছি মা। তুই কেমন আছিস?”

শীলার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, সে তার মায়ের সাথে কথা বলছে। তার মা। পাঁচ বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া মা!

সে লিখল- “আমি ভালো আছি মা!”

মা লিখল- “অন্তু কেমন আছে?”

অন্তু। শীলার নয় বছর বয়স্ক ছেলে।

শীলা লিখল- “ও ভালো আছে।”

মা লিখল- “অনন্ত বাবা কেমন আছে?”

অনন্ত রায়। শীলার স্বামী। ইঞ্জিনিয়ার। মেরিন। বেশিরভাগ সময় তাঁকে বাইরে বাইরে থাকতে হয়। জাহাজে।

শীলা লিখল- “ভালো আছে মা সবাই!”

মা লিখল- “অন্তুর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে মা শীলা। একটু দিবি? কতকাল তাকে দেখি না। কতযুগ তার কথা শুনি না! ও কি এখনো স্কুলে যাবার সময় কাঁদে? ও কি এখনো ঘুমানোর সময় গালের মধ্যে আঙুল পুরে দেয়? ও কি “দিদু দিদু” বলে এখনো কাঁদে? কার্টুন দেখে এখনো খাওয়ার সময়? ওকে কখনো মারিস নে শীলা! গায়ে হাত দিয়ে কখনো কাউকে মানুষ করা যায় না! কবে আমি ওকে একটু কোলে নিতে পারব কে জানে!”

শীলা মায়ের এত কথার কোনো জবাবই দিল না! প্রথম কথাটাই সে শুনেছে কেবল! তারপরই সে সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বেঁচে থাকাকালীন যেমন ছিল, এখনো তেমনই জবাব দিল শীলা। চ্যাটে এইভাবে দুই একটা কথা বলতে না বলতেই শীলার আসলে মায়ের প্রতি আকর্ষণের মাত্রা কমে গেছে ততক্ষণে!

বলল- “মা, ওর সামনে পরীক্ষা। তুমি তো জানোই। বরাবরই ও ভূগোলে কাঁচা। পড়ছে এখন। পরে কথা বলব মা। এখন রাখছি।”

মা কী জবাব দিল তা দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না শীলা। তার মন তখন ছেলে কী পড়ছে বা আদৌ পড়ছে কিনা সেটা দেখার দিকে চলে গেল। মায়ের মেসেঞ্জার থেকে বেরতেই তাকে আলাদীন বলল- “মায়ের সাথে ভিডিওতে

কথা বলবেন না?”

অন্যমনস্ক শীলা বলল- “এত চেষ্টা করি, এত মাস্টার দিলাম। কিছুতেই ওর ভূগোলের নম্বর হায়েস্ট আসছেই না!”

আলাদীন লিখল- “আপনার মৃত বাবা-মায়ের সাথে একদম সামনাসামনি দেখাও করিয়ে দিতে পারি। যাবেন? দেখা করবেন? বাবাকে ছোঁবেন? এই বুড়ো বয়সেও মায়ের কোলে বসার সুযোগ হারাবেন না! শুনছেন শীলা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?”

শীলা তখন বোবা। শীলা তখন কালা। শীলা তখন মা। তার চোখের কোনে যে বাষ্প জমেছিল তা কঠিন রোদের স্পর্শে এসে ঝরে পড়ছে তখন। সে তার জীবনে প্রকৃত ভালোবাসার খোঁজ পেয়েও তাকে ত্যাগ করল অনায়াসে! একবারো সে মা-বাবার সাথে দেখা করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করল না! যা অসম্ভব, যা পাওয়া কোনোদিনই সম্ভব নয়, পৃথিবীতে ব্যক্তি মানুষকে প্রকৃত ভালোবাসার মানুষই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরকে হারাবার পরও ফিরে পাওয়া আসলে জীবনের সমস্ত পাওনার ঊর্ধ্বে! শীলা সেই পাওনাও দুই পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আত্মঘাতী শীলা কী চায়? সে ছেলে অন্তুর পড়ার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ছেলে তখন পড়ছে-

“জলের বায়বীয় রূপকে জলীয় বাষ্প বলে।

প্রমাণ চাপে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয়। ইহা বর্ণ ও গন্ধহীন একটি গ্যাসীয় পদার্থ!

কঠিন, তরল ও বায়বীয় প্রাকৃতিক কারণেই জল এই তিনটি অবস্থানে ঘোরাফেরা করে!”

চোখ বন্ধ করে শীলা তখন প্রার্থনা করছে- “মা, আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করো।”

বৃষ্টির শব্দ অথবা অদৃশ্য মায়া

বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। খটখটে মরুভূমি ছেড়ে বোকা-সোকা এক অদৃশ্য মায়া উড়ে চলল। একটু ভিজতে চাওয়া কামনা আঁখির গোলকে কি?

দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল অদৃশ্য মায়া। সে জবরদস্তি একটা পাগল-প্রায় অবয়বকে টেনে নিয়ে চলল তার পিছু পিছু। পিছনে পড়ে রইল বাবা-ভাই। বাবা বলেন-"কোথায় যাচ্ছিস? একটুও কি বুদ্ধি নেই তোর?"

ভাই বলল- "মা কি তোর একার? আমার কি সে কেউ নয়? তুই এমন করছিস কেন দি?"

ভিখারির মতো হাত পাতল সেই অবয়ব! একটু বৃষ্টি দেখব।

অদৃশ্য মায়ার চোখে ঘোর! চোখে মায়াঞ্জন। চোখে হাহাকার। কিন্তু তা নির্বিকার। চোখের এই সমস্ত কিছু দেখতে চাইলে যে চোখ লাগে তা বাবা-ভাইয়ের নেই। অদৃশ্য মায়া পথ চলে। ভেসে ভেসে। কিছুর টানে। কে যে এমনভাবে টানে সে কিছুই বোঝে না। শুধু চলে। টলতে টলতে। যেন বা সে খোঁড়া। যেন বা অন্ধ। কিচ্ছু দেখছে না। সূর্যের আলো তার রেটিনায় যেন প্রতিফলিত হচ্ছে না! কেউ আগে আগে চলছে তার! ওই যে, ওই তো! অস্পষ্ট কিন্তু দৃঢ়! হাত ছাউনি দিয়ে ডাকছে... আয়... আয়... আয়...!

মায়া নিজে অদৃশ্য কিন্তু তার দৃষ্টি প্রখর! সে যতটা না দুই চোখ দিয়ে দেখছে, তার থেকে অনেক বেশি দেখছে অনুভূতি দিয়ে! ডাকছে কেউ... আয়... আয়...আয়...! অদৃশ্য মায়ার বুকে উথাল-পাথাল ঢেউ। পাঁজরের মধ্যে লকলক করছে... দাউ দাউ জ্বলছে...! কে? কে তুমি? এভাবে ডাকছো! ওই তো দেখতে পেয়েছে সে...! ওই তো উড়ছে আঁচল...! উড়ছে... উড়ছে...!

তোমার মুখ দেখতে পাইনি এখনো। কিন্তু কেন? মুখ না দেখা গেলে কেমন করে তোমার বুকে মাথা রাখব? বলো! কে? কে তুমি? বিড়বিড় করে অবয়ব! মায়া খামচে ধরে অবয়বের বুক। জ্বলছে! জ্বলছে! আহ! পুড়ছে! একদম হঠাৎ বাবা ডাকলেন- "কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া মা!"

সারাজীবন বড্ড বাধ্য অবয়ব ভাবল যে, এই আওয়াজ কানে গেলে শুনতে হয় তা! অদৃশ্য মায়া কিন্তু কিচ্ছু বুঝল না। শুনল না। বোঝার জন্য বা শোনার জন্য তার কোনো দায় নেই। সে তার ইচ্ছেডানার উপর দায়বদ্ধ কেবল। তাই সে ছুটতেই চাইল অবয়বকে নিয়ে। ফলে মুহূর্তের এক চিলতে সময়ের মধ্যেও ঘটে গেল ঘটনাটা। সামনের একটা মাটির ঢিবিতে হোঁচট খেয়ে তুমুল আওয়াজ করে অবয়ব মুখ থুবড়ে পড়ল। হাঁটু দুটোতে বেশ লাগল। লাগল থুতনিতেও। সবচেয়ে জোরে লাগল বুকে। যেখানে জ্বলছিল রি রি , যেখানে পুড়ছিল ধিকি ধিকি, তারই আবরণের উপর মোক্ষম আঘাতটা পড়ল! কিন্তু অবয়বের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মতো ইচ্ছে অদৃশ্য মায়ার নেই। সে বরং বিরক্ত হলো এই হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হওয়ায়। অবয়ব নিজেও বুঝতে পারল না যে এত জোরে তার লেগেছে। সে পড়ে যাবার পরও উঠতে গেছিল। কারণ পড়ে যাবার পর তার বোধে এই অর্থ প্রতীয়মান হয়েছে যে, অদৃশ্য মায়া বিরক্ত হতেই পারে! সে মায়ার পোষা ভৃত্য বই কিছু তো নয়! নিচু মাথা, ভূমিতে মিশিয়ে পড়ে থাকা বুক উপরে তুলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল। দৃষ্টি খুলে দেখতে চাইল দূরের আহ্বান। পরমুহূর্তেই এক আকাশ গভীর অন্ধকার তার দৃষ্টিকে ঢেকে দিল। বাবা আর ভাই যখন সেই অজ্ঞান অবয়বকে ধরে ধরে নিয়ে চলল, নিয়ে চলল ইট-সিমেন্ট-বালির তৈরি আচ্ছাদনের ভিতর, তখন ভাইটা কাঁদছে। বাবার চোখ দুটো টকটকে লাল। সব হারানোর বেদনায় মানুষ যখন একটু অশ্রু ঝরাতে চায়, তখন তার সান্ত্বনা জোটে, কিন্তু সব হারানোর পরেও বাবাকে যখন একমাত্র কন্যা সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে নামতে হয়, তখন তাঁর অশ্রু ফেলার ফুরসত মেলে না! তিনি ফোন তুলে নিলেন হাতে!

"ড. চৌধুরী, আপনাকে আবার একবার আসতে হবে। এক্ষুনি...!"

পারিবারিক ডাক্তার একটু আগেই সার্টিফিকেট দিয়ে এসেছেন। মানুষ মারা গেলেই তাকে পোড়াতে বা কবর দিতে হয়। বস্তুত মৃত্যুর মতো কঠিন সত্য জগতে আর দুটো নেই। আর শরীর থেকে প্রাণটুক বেরিয়ে গেলে ওই শরীরে আর কোনো মায়া থাকে না। তখন শরীরটাকে নষ্ট করে দিতেই হয়। ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে শরীর বিলীন হয়ে যায়। এ সবই কঠিন

সত্য। যে মুহূর্তে মাতৃগর্ভে একটি ক্ষমতাবান শুক্রাণু অন্যান্যদের পরাজিত করে নিষিক্ত করেছে ডিম্বানুকে সেই মুহূর্তেই সে জন্ম এবং মৃত্যু এই দুইয়ের জন্যও তৈরি হয়েছে। মায়াময় জগতের এই সত্যটুক বুঝতে পারেনি, কুড়ি বছরের কলেজ পড়ুয়া মেয়েটা! ঘরে সুন্দর বিছানায় পড়ে আছে তার পঁয়তাল্লিশ বছরের সুন্দরী মা। মায়ের শিয়রে বাবা বসেছিলেন অনেকক্ষণ। ভাইও। সেও ছিল। ডাক্তার এলেন। লিখলেন। চলে গেলেন। ভাই কাঁদছে চিৎকার করে। পাশের কাকিমারা এসেছে। মেয়েটা দেখেছে। মেয়েটা মায়ের বোজা চোখে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ অবলোকন করেছে। কিছু বুঝতে চেয়েছে। কিছু বুঝতে পারেনি। কিছুই না। বুঝতে চেয়ে মুখ উঁচু করেছে। দেখেছে দেওয়ালে বিভিন্ন পোজে মায়ের ছবি। তানপুরা নিয়ে বসে আছেন এক যুবতী। সাদা খোলের উপর বুটি দেওয়া লাল পাড় তাঁতের শাড়িতে তাঁকে অপ্সরী লাগছে। এক মাথা চুল পিঠ ছাপিয়ে মেঝে ছুঁই ছুঁই। পাশে আরও অনেক ছবি। অনেক। সেরার শিরোপা নিচ্ছেন একজন যুবতী। এসব মায়ের অল্প বয়সের ছবি।

তখনো তাঁর স্কুল তৈরি হয়নি। স্কুল হবার পর তিনি নাওয়ার-খাওয়ার সময় পেতেন না। গত রাতে মায়ের গুরুজি এসেছিলেন। মা বহুদিন বাদে গুরুজিকে পেয়ে উৎফুল্লও ছিলেন। স্কুলের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে গুরুজিকে বন্দনাকারী গান শোনাচ্ছিলেন। গানই ছিল মায়ের অন্তরের দেবতা। মায়ের সবকিছু। সব। সব্বাই সেটা বুঝত। মা বলতেন "আমি মরব না। দেখিস! মরলেও আমার সামনে রবী ঠাকুরের গান গাইলেই আমি উঠে পড়ব! ওই সুর, ওই কথা শুনলে কেউ মরতে পারে না! যমদূতও ফিরে যাবে কাঁদতে কাঁদতে!"

সেই মা গান গাইতে গাইতে একদম হঠাৎ মাথাটা একদিকে কাত করে চুপ হয়ে যান। সমস্ত পরিবেশ সেই মুহূর্ত থেকেই যেন পালটে যায়। গান ছাড়া তানপুরা হাতে মা! এত্ত বিসদৃশ্য যা জন্মের পর বা চোখ ফোটার পর দেখেনি মায়ের মায়ায় আবদ্ধ কেউই। মাকে তানপুরা ছাড়া করা হলো। এটাও এযাবতকাল ঘটেনি। মা তানপুরা ধরলে নিজেই ছাড়তেন, অন্য কেউই ছাড়াতে পারতেন না। সেই মায়ের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হলো তানপুরা এবং মাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। সকলের কাছে বিষয়টা হৃদয়-বিদারক নিশ্চয়ই। সকলেই নইলে ওভাবে চিৎকার করে কান্নাকাটি করবে কেন?

ডাক্তার এলেন মিনিট কুড়ির মধ্যে এবং মায়ের শরীরে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে দেখলেন। নাড়ি দেখলেন। চোখ খুললেন। আরো কিছুক্ষণ থম মেরে বসে

রইলেন। সেই মুহূর্তটাই দায়ী হয়ে রইল আত্মজার শরীর থেকে মায়াটুকু আলাদা হবার জন্য। সে কিছু যেন দেখছে না। কিছু যেন শুনছে না। তার মা আর বলেননি কথা। আর চেয়ে দেখেননি তার পানে। আর গান গাননি। আর তানপুরা ছোঁননি। মেয়ে কী ভাবছে তা সে জানে না। শুধু তার মনে হয়েছে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। তুমুল বৃষ্টি। সে সেই বৃষ্টি দেখতে চায়। মাখতে চায় সারা গায়ে। ওই বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা যেন তার। যেন তারা অনেক কথা বলছে। শোনার কেউ নেই।

একটা শরীরের ভিতরেই যে মায়া থাকে তার কথা যেন শোনার কেউ থাকে না। আর বৃষ্টির শব্দের বলা কথা না শুনলে সব শূন্য! সব মরীচিকা! আত্মজার ইন্দ্রিয় সমস্তই দেখতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ভিতরের মায়া কিচ্ছু বিশ্বাস করছে না।

একজন সুন্দরী যুবতী এইসময় হঠাৎ ছুটে এলো। আছড়ে পড়ল ওই লাশের উপর। এই যুবতীকে হঠাৎ যেন দেখতে পেল অবয়বটি। এই যুবতীর মুখ এখন প্রায়ই দেখা যায় টিভির পর্দায়। অথচ সে তার বাবার সাথে ভিক্ষে করত। একদম ছোট্টবেলায়। আরও ছোটোবেলায় তাদের ছেড়ে, তাদের মা চলে গেছিল না ফেরার দেশে! তাকে হাতে ধরে গান শিখিয়েছেন যে মহিলাটি, যাঁকে সে মায়ের মতো অথবা ঈশ্বরের মতো ভাবতো, সেই মেয়েটি এখন ওই মৃত শরীরটাকে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছে। কতজন কত কিছু বলছে। যার যেমন মনে হচ্ছে। কেউ শরীরের চোখে তুলসিপাতা দিয়ে দিল। কেউ শিয়রে দিল ধূপকাঠি জ্বেলে। বুকের উপরে কেউ একখানা গীতা রাখল।

প্রত্যেকেই নিজেদের কর্তব্য করছে। কর্তব্য ঈশ্বরের থেকেও বড়ো। অনেক বড়ো। কর্তব্যের ভার এত বেশি যে প্রিয় স্বামী, প্রিয় পুত্রসন্তান চোখ মুছে মায়ের সিঁথিতে দিয়ে দিল এয়োতির অহংকারের শেষ চিহ্ন সিঁদুর। পায়ে আলতা। মেয়েটি কোনো কর্তব্য করতে পারছে না। খটখটে চোখে সে বৃষ্টির চিহ্ন খুঁজে চলেছে। কর্তব্যের চিহ্ন নেই ধারে কাছে কোথাও।

মেয়েটিকে তার বাবা, ভাই ঘরে আনার পর বেড়ে যায় তার ছটফটানি। ডাক্তার আসেন। ইতিমধ্যে মায়ের শরীর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নাড়ির বন্ধন ছিন্ন হলেও সব ক্ষেত্রে হয়ত হয় না! মেয়ে তাই জানতেও পারে না যে তার মায়ের শরীরটাও আর সে দেখতেও পাবে না!

এত বড়ো একজন শিল্পীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়ে রবীন্দ্র সদনে তার মরদেহ রাখা হয়েছে। ফুলে ফুলে ছাওয়া গাড়িতে ফুলের মতো

ভোরে ফুলের মতো সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। টিভিতে এলাকার সমস্ত মানুষ দেখছে। যে মানুষটি লাশ হবার পরেও গৃহে শুয়েছিল যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে, শ্রদ্ধার কর্তব্যে তার লাশের উপর তখন পাহাড় প্রমাণ ফুলের বুকে। মানুষটি শুয়ে আছে। নিথর। আত্মজার ঘরে ডাক্তার। ইংজেকশান দিলেন। বাবাকে বল্লেন “আপনার মেয়েকে ঘুম পাড়াতে না পারলে সমূহ বিপদ! ওর হার্ট রেট বিপদসীমা ছাড়িয়েছে।”

মেয়ে ঘুমায় না তবুও। পার হয়ে গেছে নির্দিষ্ট সময়-সীমা। ডাক্তার আবার দিলেন ইঞ্জেকশান আর বল্লেন- “এবারেও যদি না ঘুমায় তাহলে হাসপাতালে এডমিট করতে হবে!”

একটু একটু করে সময় পার হচ্ছে। ডাক্তার ঘড়ি দেখছেন আর মেয়ের হার্টবিট মাপছেন। ভর্তি করিয়ে দিতে না পারলে তিনি তাঁর কর্তব্যে গাফিলতি হবে বলেই মনে করেন। বাবার চোখ মেয়ের দিকে। মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য ডাক্তার ডাকা তাঁর কর্তব্য। মেয়ের চোখ টিভির পর্দায়। ক্যামেরা এখন মায়ের মুখ ছেড়ে ফুলের উপরে। একজন কোনো একটা চ্যানেলে রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীর স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। কান্নাটা অনুচিত বুঝে মুখ ঢাকলেন। লাশ-বহনকারী গাড়ি চলতে শুরু করেছে ততক্ষণে! একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে শরীর... ডাক্তার চৌধুরী মেয়ের নাড়ি দেখতে দেখতে বাবার দিকে চাইলেন। বাবা বুঝলেন এবার তাঁকে এম্বুলেন্স ডাকতে হবে। তিনি ফোন খুলে নম্বর খুঁজছিলেন যখন... ঠিক সেই সময় ঘটল ঘটনাটা। টিভিতে একটা সুর! হ্যাঁ, একটাই সুর ভেসে এলো। মেয়ে চমকে উঠল। এই সুর তাকে সমে নিয়ে গেল। এই সুরে সে মাকে চিনতে পারল। এই একটিমাত্র সুরের কথায় সে আষ্টেপৃষ্ঠে মায়ায় জড়িয়ে পড়ল! এই মায়া তাকে আজীবন ভালোবেসেছে। এই মায়ায় সে নত হয়ে গেল! এই মায়ায় সে বাঁচতে শিখল। এই মায়ায় সে মাকে ভুলতে শিখবে। এই মায়ায় সে সারাজীবন মাকে ভালোবাসতে বাসতে একদিন মৃত্যু বরণ করবে!

টিভিতে গানের কলিগুলো তাকে তার সমস্ত মায়া যখন ফিরিয়ে দিল, তখন সে হাহাকার করে কেঁদে উঠল।

মা... মাগো... মা...

মেয়েটি কাঁদছে! প্রতিটি প্রাণীর বুকে বাস করে যে মায়া তাকে ছাড়া কেউই বাঁচতে পারে না! তাকে ছাড়া মৃত্যুও অসম্ভব! তাকে বুকের মধ্যে পুরে নিয়েই মেয়ের দুটি চোখ ভেসে যাচ্ছে! গানটা যতো এগুচ্ছে মৃত মায়ের মায়ারা ততই

অশ্রু হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে তাজা মেয়ের বুকে! জীবন মানেই মায়া! আহা মরণ মানেও মায়া!

টিভির পর্দা তখনো মায়া ছড়াচ্ছে-

“দেখো, আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা, এত আনন্দ আয়োজন... সবই বৃথা আমায় ছাড়া...!

ভোরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা

এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসাব সারা...

অসতো মা সৎগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতগময়!”

বসন্তের অপেক্ষায় অদিতি

আমাদের এই গল্পের নায়িকার নাম অদিতি। জন্ম থেকে কলেজ যাওয়া পর্যন্ত সে একদম সাধারণ একটা মেয়ে থাকল। কিন্তু হঠাৎ অদিতির জন্য একটা পাত্র দেখা হলো। তার মা আর বাবা চাইল, অদিতির এবার বিবাহ হয়ে যাওয়া উচিত। তারপর থেকেই অদিতি একজন নায়িকা। অদিতির মা অতি সাধারণ এক গৃহস্থ বধূ। সে অদিতির এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে মানতে পারল না। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অদিতির মা অদিতির নামে ভুরি ভুরি অভিযোগ করতে লাগল। অদিতি নাকি কানে শোনে না। চোখে দেখে না। বাবা সব শুনে বলে- “তোমার কিছু ভুল হচ্ছে না তো?”

অদিতির মা বলে- “আমি কি ওর সৎ মা? যে ওর নামে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলব!”

ঠিক সেই সময়েই সামনে দিয়ে অদিতি হেঁটে যায়। মা ডাকে- “অদিতি? এই অদিতি?”

অদিতি ফিরেও চায় না। ঠিক কাঠের পুতুলের মতো হেঁটে হেঁটে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

মা বলে- “দেখলে তো! দেখলে তো! বিশ্বাস হলো তো!”

বাপ বলে- “কিন্তু কেমন করে এমন পালটে গেল আমাদের সহজ-সুন্দর মেয়েটা?”

মা বলে- “জানি না। বিয়ের কথা বলতেই...!”

ঠিক সেই সময় হঠাৎ অদিতি নিজের ঘর থেকে একদম স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে মা আর বাবার সামনে এল। আর মায়ের দিকে চেয়ে বলল- “কিন্তু আমি যে রোদ্দুরকে ভালোবাসি, মা!”

মা অবাক হয়ে বলে- “কিন্তু ও তো তোর থেকে বয়সে অনেক বড়ো!”

অদিতি বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। ঠিক সেইসময় কাঠ-ঠোকরা পাখির আওয়াজ ভেসে আসে... ঠক... ঠক... ঠক। অদিতি শোনে ঠগ... ঠগ... ঠগ। আকাশের চাঁদ যেভাবে পুকুরের জলে বয়ে যায়, সেইভাবে কেঁপে কেঁপে অদিতি বলল- “বয়সে বড়ো হলে বুঝি ভালোবাসা যায় না?”

মা বলল- “না, যায় না। মানুষ ভালোবাসে কেন? সুখী হবে বলেই তো! তাই না?”

অদিতি জবাব দেয় না। খালি টের পায় কোথাও যেন ঘন-কালো মেঘ করেছে। সে অপেক্ষা করে। মেঘ সরে যাবার অপেক্ষা!

অবশেষে রাতের বেলায় সে বাবাকে বলে- “বাবা, আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না! আমি রোদ্দুরকে ভালোবাসি!”

বাবা বলে- “মারে, তুইও সেই একই ভুল করে ফেললি অন্যদের মতো?”

নিশির অন্ধকার অদিতির দুই চোখে আশ্রয় গ্রহণ করল। সে জলভারে স্ফীত মেঘের মতো টলটলে চোখে চেয়ে রইল।

বাবা বলল- “আরে ও তো উত্তর মেরুতে থাকে। আর আমরা দক্ষিণ মেরু! ভালোবাসা কখনো স্বার্থক হবে না তোদের! আর তাছাড়া মানুষ কেন ভালোবাসে? সুখী হবার জন্যই তো! তাই না? তো তোদের কখনো মিল হবে না! ওকে তুই ভুলে যা মা!”

অদিতি টের পায়, আকাশে হু হু মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে। ঘন কালো, ভারি। তার বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। দম বন্ধ হয়ে আসে। অক্সিজেনের অভাবে ডাঙায় তোলা মাছের মতো সে ছটফট করে ওঠে। অদিতি বাবার সামনে থেকে ছুটে পালায়। তার চোখে না পাওয়ার যে বেদনা ফুটে উঠেছে তা বাবাকে সে দেখাতে চায় না!

ঠিক তখনি আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বিদ্যুৎ ঝলকে ওঠে এবং সেই সাথে মেঘ ডেকে উঠল গুড়ুম গুড়ুম! তারপর তৃষ্ণার্ত মাটির বুকে গরমের হলকা শুষে নিয়ে, প্রকৃতিতে সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে থাকে। অদিতি তখন উপুড় হয়ে বালিশ ভেজাচ্ছে। সারারাত তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল প্রকৃতি।

বৃষ্টিস্নাত বিধ্বস্ত ও শান্ত প্রকৃতিকে দেখে পরদিন ভোরে অদিতির সেই

রোদ্দুরকেই মনে পড়ল। সে জানে না যে, সে সুখী হবে কিনা! তবে এটুক সে জানে যে, রোদ্দুরকে ভোলা তার পক্ষে অসম্ভব!

অদিতি ঠিক করল যে, সে রোদ্দুরের ব্যাপারে তাদের সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাসা করবে। রোদ্দুর সত্যিই তার বা সে রোদ্দুরের অযোগ্য কিনা! সেইমতো সে তার ইচ্ছের কথা তার মাকে জানায়।

মা বলল- "আত্মীয়রা কখনো মা-বাবার চেয়ে বেশি আপন হতে পারে না!"

মা আরও বলল যে, অদিতি যদি এই বিবাহের ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে সে অতি অবশ্যই মিসগাইডেড হবে!

অবাক অদিতি বলে- "বিবাহের কথা তো তুলছিই না, মা!"

মা বলে- "দুই আর দুইএ চার করতে কারোরই বেশিদিন লাগবে না!"

অদিতি বলে- "আত্মার সাথে সম্পর্ক বলেই তো আত্মীয়, মা! আমি রোদ্দুরকে ছাড়া বাঁচতে পারব না মা!"

এবার অদিতির মা রেগে গেল। সে যত রেগে কথা বলে, অদিতি তত পাথর হয়। মা যত বলে অদিতি তত কঠিন হয়। কালা হয়। বোবা বোবা চেয়ে থাকে। অদিতির মনে হয় যেন কালবৈশাখী ধেয়ে আসছে। তছনছ করে দেবে সব। অদিতি ঝড় ওঠার আগের প্রকৃতির মতো থম মেরে যায়। তার মায়ের আত্মীয় সম্বন্ধে বহু পুরানো ঘটনা-সমৃদ্ধ আলোচনায় মামা-কাকা-মাসি-পিসি-দাদু-দিদুন-ঠাম্মির কঙ্কাল দেখতে পাচ্ছিল সে। আর নিজের মাকে তার মনে হচ্ছিল শেঁওড়া গাছের পেত্নি। মা একসময় থামল। কিন্তু অদিতি ততক্ষণে পুনরায় বোবা-কালা এক নতুন প্রাণী। অদিতি তার এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারে না কিন্তু এখানে তার কোনো হাত নেই!

সে সারারাত ভাবল। এই পরিস্থিতি থেকে তাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে রোদ্দুরের আসল পরিচয়! হ্যাঁ। ঠিক। সে তার সমস্ত কলেজের বন্ধুদের ফোন করল। রোদ্দুরকে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই চিনবে। যদিও সে নিজেই রোদ্দুর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না! সে শুধু ভালোবাসে। ভালোবাসাটুকই আছে তার প্রাণমন জুড়ে। আর কিচ্ছু নেই। রোদ্দুরের সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানবার প্রয়োজনই পড়েনি তার। কোনো এক বসন্তের বাতাসে তার যখন ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল, রোদ্দুর তাকে কবিতা শুনিয়েছিল, তার তখন মনে হয়েছিল, সে এই কবিতার পিপাসা না মিটলে হয়ত মরেই যেত। তার যখন কান্না পেয়েছিল কোনো এক নিগূঢ় অন্ধকার বর্ষণমুখর রাতে, তখন রোদ্দুর

তাকে শুনিয়েছিল কালিদাসের মেঘদূত! কখনো একাকিত্বের যন্ত্রণায় এতখানি ভেঙে পড়েনি অদিতি, যতখানি রোদ্দুরের জন্য সে গুঁড়িয়ে গেছে। রোদ্দুর তার জীবনে না এলে সে তো বিরহের মানেই বুঝত না! সত্যি বলতে বাড়ি থেকে তার বিবাহের সিদ্ধান্ত না নিলে, সে যে রোদ্দুরকে ছাড়া বাঁচবে না, তা বুঝতেও পারত না। আর তখনই সে বুঝেছে যে, সে রোদ্দুরকে ভালোবাসে। এখন যে কোনো উপায়েই হোক না কেন রোদ্দুরের পরিচয় তাকে জানতেই হবে।

অদিতি জানে যে সে নরম-শরম এক নারী মাত্র। সে সুন্দরী। সে নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে রোদ্দুর ছাড়া কাউকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে না! সে মা-বাবার মতামত শুনেছে। এবার সে তার একান্ত গোপন অনুভূতি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করল। সে বলল, সে রোদ্দুর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই না জেনে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। বন্ধুরা অভয় দিল। এই ডিজিটাল যুগে এক মুহূর্তেই সমস্ত তারা জেনে নেবে। অদিতির এক বন্ধু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল। অতঃপর সে রোদ্দুর সম্পর্কে যে তথ্য দিল তা শোনার জন্য অদিতি মোটেও প্রস্তুত ছিল না!

সে বলল- “রোদ্দুর তো তোর থেকে বয়সে অনেক অনেক ছোটো রে! অনেক ছোটো...! এতটাই ছোটো যে তোদের মধ্যে বিবাহ অসম্ভব!”

অদিতির তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল! কে সত্যি? কে মিথ্যে?

অদিতির মনের আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল রোদ্দুর। অদিতি কোনো কারণ জানে না। কেন রোদ্দুর তার কাছে এত আকর্ষণীয়? কেন তাকে সে ভুলতে পারছে না? কেন তাকে ভাবলেই নদীর ধারে কাশফুল ফোটে? কেন শিউলিতলায় ওই সুন্দর ফুলগুলো ঝরে পড়ে? ঝরেই যদি পড়ে শুকায় না কেন? কেন একদম টাটকা ফুলগুলো খিলখিল হাসে আর অদিতিকে আহ্বান করে? অদিতি শোনে যে সে রোদ্দুরকে পেতেই পারে না! কেননা রোদ্দুর তার থেকে বয়সে অনেক ছোটো! তবু সে ছুটে বার হয়! সে শিউলিতলায় ছুটে যেতেই কোথাও দুর্গাবোধনের মন্ত্রোচ্চারণ হয়!

অদিতি নতুন করে রোদ্দুরের খবর জানতে চায়! আর এবারেও অনেক অনেক তথ্য পায়! তার এই বন্ধুটি বলে যে, সে ফোনে নয়, রোদ্দুরের বাড়িতে গিয়ে ওর সমস্ত সংবাদ নিয়ে এসেছে। রোদ্দুরের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু রোদ্দুরের মায়ের সাথে সে কথা বলেছে। অদিতি অধীর আগ্রহে শুনতে থাকে। এবার নিশ্চয়ই সঠিক সংবাদটি সে পাবে! রোদ্দুরের মা কখনোই মিথ্যা বলবেন না। কিন্তু বন্ধুটি বলল যে, রোদ্দুরের মা বলেছেন যে, আসলে রোদ্দুর

একটি ধারণা ছাড়া কিচ্ছু নয়। রোদ্দুর বলে তার কোনো সন্তান কোনোকালেই ছিল না। আজও নেই! কথা শুনে অদিতি গুম হয়ে বসে থাকল কিছু সময়। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গেল যেন! এ কী শুনল সে! এমনও হয়? সে যাকে ভালোবেসেছে তার অস্তিত্বই নেই? অদিতি বুঝতে পারছে কাশফুল নেতিয়ে পড়েছে। ধূসর ও বিবর্ণ প্রকৃতির মাঝে সে নিজে যেন এক ফুল-না ফোটা ম্রিয়মান টবের গাছ মাত্র! কোনোদিকে কোনো আশা না দেখে সে যখন আবার পুতুল-পুতুল জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, তখনই সে একদম হঠাৎ বলে উঠল- "আচ্ছা, তুই ওই ভদ্রমহিলাকে খুঁজে পেলি কেমন করে?"

অদিতির বন্ধু বলল- "কেন? জিজ্ঞাসা করে করে চলে গেলাম!"

অদিতি বলল- "কিন্তু কী জিজ্ঞাসা করলি?"

-"রোদ্দুরের বাড়িটা কোথায়?

তখন এলাকার লোকই দেখিয়ে দিল। এবং দরজায় কড়া নাড়তে এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে নিজেই বললেন যে, তিনিই রোদ্দুরের মা!"

অদিতি হাসল। প্রাণ খুলে! আর প্রকৃতিতে কোথাও যেন স্থলপদ্ম ফুটে উঠল। ফুটে উঠল ছাতিম! অদিতি নতুন আশা নিয়ে আবারও এক অন্য বন্ধুকে পাঠাল রোদ্দুরের খোঁজ নিতে। সেও যথা সময়ে ফিরে এলে অদিতি আগের মতোই আগ্রহী হয়ে শুনতে লাগল। এই বন্ধু বলল যে সে রোদ্দুরের খোঁজ পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু অদিতি রোদ্দুরকে কখনোই বিবাহ করতে পারবে না। কারণ রোদ্দুর আসলে ঠিক বিবাহের যোগ্য নয়। সে অথর্ব এবং পঙ্গু একজন মানুষ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটে তার। এই কারণেই তার মা বলে বেড়ান যে, রোদ্দুর বলে কেউ নেই। তার কাছেও যাওয়া যায় না! বিছানায় হাগু-হিসু করে পড়ে থাকে। দুর্গন্ধে তার ঘরেও প্রবেশ করা যায় না! তার মাও ওই ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না! খবরটুক দিয়ে অদিতির বন্ধু রোদ্দুরকে ভুলে যেতে উপদেশ দিল।

অদিতি আবার গুম হয়ে রইল! অনেক আশা নিয়ে আবার নতুন কাউকে পাঠাল। সেও ঘুরে এসে খবর দিল অদিতিকে। আসলে রোদ্দুর কোনো পুরুষই নয়। আর তার ভিতরে নারীর জন্য কোনো প্রেমই নেই!

অদিতি বলে- "মিথ্যা কথা! তোমরা সব্বাই মিথ্যে বলছো!" বলল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার অভিমান জন্মালো। রোদ্দুরের প্রতি তীব্র অভিমানে অদিতি বোবা হয়ে গেল। সে নিজে রোদ্দুরের জন্য এই যে এতটা পাগলামি করছে, কই

রোদ্দুরের তো কোনো হেল-দোল নেই! সে একজন পুরুষ মানুষ! অদিতির চাইতেও তারই তো অনেক অনেক বেশি এগিয়ে আসা উচিত! অদিতি ভালোবাসে রোদ্দুরকে। তাহলে রোদ্দুর কি একটুও ভালোবাসে না?

অদিতি মনে মনে তীব্র অভিমানে একদম কালা আর বোবা হয়েই রইল! কতযুগ যেন কেটে গেল! কত কত বার রামচন্দ্র জন্ম নিলেন! কত কত বার যেন শ্রী কৃষ্ণ জন্মালেন! অদিতি পুতুল-পুতুল হয়েই রয়ে গেল! সে রোদ্দুর ছাড়া কিছুই ভাবল না। কিন্তু কোনো অদিতি বা রোদ্দুরের জন্য আহ্নিকগতি থেমে থাকে না। তাই একদিন অদিতির বিবাহের দিন এগিয়ে এল। আজ অদিতির বিবাহ। সমস্ত বাড়ি উৎসবে ঝলমল করছে! খুশি উড়ে বেড়াচ্ছে। সুন্দর-সুন্দর মেয়েরা প্রজাপতির পাখার মতো ফুরফুর করে উড়ছে! সুখ-সুখ হাওয়া। খুশি খুশি মানুষ! শুধু অদিতির মনে সুখ নেই। তীব্র শীতে তার মন জুবুথুবু। সেখানে কোনো চঞ্চলতা নেই। বোজা বোজা চোখে কোনোরকমে চেয়ে আছে সে। তার মনের গাছেদের পাতা খসে খসে পড়ছে। তার অন্তরের সুখেরা কোথায় যেন মুখ লুকিয়েছে। মনে তার হাজার প্রশ্ন। তার মা ভুল? বাবা ভুল? বন্ধুরা ভুল? নাকি সে নিজে ভুল? অথবা রোদ্দুরই ভুল! হয়ত তাই!

অদিতি নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দেয়। নিজেই নিজের বুকে হাত বোলায়।

বলে- "কাঁদিসনে আর! আমি জানি সে আছে। তার অস্তিত্ব না থাকলে আমি কেমন করে তার প্রেমে পড়লাম? তাই সে অবশ্যই আছে। কিন্তু সে হয়ত আমায় ভালোবাসে না!"

অদিতি ভাবে। ভাবতে ভাবতে সে নিজেকেই প্রশ্ন করল। রোদ্দুর কি তবে এই পার্থিব জগতের কেউ নয়? শুধু তার স্বকপোল-কল্পিত মায়া মাত্র? আকাশ-কুসুম রচনা? আর কিচ্ছু নয়? অদিতির চোখ বলল যে সে শুধুমাত্র রোদ্দুরকে দেখবে বলেই অপেক্ষা করছে! অদিতির কান বলল- "সে অপেক্ষা করছে রোদ্দুর তাকে কবে ভালোবেসে আহ্বান জানাবে তার জন্য! অদিতির নাসারন্ধ্র, তার জিহ্বা, তার অনুভূতি সব্বাই অপেক্ষা করছে... প্রকৃত ভালোবাসা অদিতিকে জড় প্রাণীতে পরিণত করেছে।"

বিবাহের অনুষ্ঠানেও অদিতি রোদ্দুরের অপেক্ষা করছে... একবার ভালোবেসে তার রোদ্দুর আসুক..., একবার তাকে ডাকুক..., সে সম্পূর্ণ হতে চায়..., সে ধরা দিতে চায়..., ভালোবাসা ছাড়া সে আর কিচ্ছু চায় না... এবং সেই ভালোবাসাটুক হতে হবে রোদ্দুরেরই..., আর কারো নয়...!

অধীর আগ্রহে যখন অদিতি অপেক্ষা করছে ঠিক তখনই বিয়ে বাড়ির মেয়ে মহলে গুঞ্জন উঠল- “বর এসেছে... বর এসেছে...”!

মেয়েরা উঠে গেল বর দেখতে। অদিতি বোবা চোখে চেয়ে রইল! সানাইয়ের সুর যে এত করুণ তা জানা ছিল না অদিতির...!

সে কিছুতেই তার এই মেহেন্দি লাগানো বাহু দিয়ে অন্য কারো গলায় বরমাল্য পরাতে পারে না...! অথচ সে অসহায়! সে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত! শুধু একবার রোদ্দুর আসুক। একবার বলুক সে তাকে ভালোবাসে! ঠিক এই সময় অদিতি সম্পূর্ণ একা। সে ইচ্ছে করলেই যা খুশি করতে পারে! সে কি তবে আত্মহত্যা করবে? রোদ্দুর তো এলো না তার জীবনে! অথচ সানাই বেজে উঠেছে। এসে গেছে বরযাত্রীরাও। ঠিক সেই সময় বিয়ে বাড়ির সুসজ্জিত গেটে এক নতুন আগন্তুকের আবির্ভাব! খুব সুপুরুষ! প্রকৃত ভালোবাসার জীবন্ত ঈশ্বরকে যাঁরা যোগ্যতা দিয়ে বিচার করেন, রোদ্দুরকে সেই সমস্ত লোকেরা দেখতেই পেল না! দশের চক্রে ভগবান ভূত হলেও, প্রকৃত প্রেমিকের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই রোদ্দুর সকলের কাছে থেকে গেল অধরা এক কল্পনামাত্র। আর তাই সব্বাই যখন বর ও বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় বোবা অদিতির কণ্ঠে উচ্চারিত হলো- “রোদ্দুর! তুমি!”

সানাইয়ের করুণ সুর ছাপিয়ে কোথায় যেন কোকিল ডেকে উঠল!